Vol. 60 | No. 3 | 2025

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্রাচীন বাংলার সংগীত-ঐতিহ্য: চর্যাপদের গায়ন-পদ্ধতি ও পুনর্জাগরণ প্রসঙ্গ

Volume	60
Issue	3
Year	2025
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Saymon Zakaria
Published online	November 30, 2025
DOI	10.62328/sp.v60i3.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v60i3.4
Pages	57-81
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৬০ সংখ্যা: ৩
আষাঢ় ১৪৩২॥ জুন ২০২৫
প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০২৫
Issue DOI: 10.62328/sp.v60i3

DOI: 10.62328/sp.v60i3.4
প্রবন্ধ জমাদান: ১৩ এপ্রিল ২০২৫
প্রবন্ধ গৃহীত: ২২ জুন ২০২৫
পৃষ্ঠা: ৫৭-৮১

প্রাচীন বাংলার সংগীত-ঐতিহ্য: চর্যাপদের গায়ন-পদ্ধতি ও পুনর্জাগরণ প্রসঙ্গ

সাইমন জাকারিয়া
উপপরিচালক, বাংলা একাডেমি
ইমেইল: dr.zakariasaymon@gmail.com

সারসংক্ষেপ

চর্যাপদ শুধু প্রাচীন বাংলার সাহিত্যিক নিদর্শন নয়, সাংগীতিক ঐতিহ্য হিসেবেও এর বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্ন ধরনের ইতিহাস ও সংগীত বিষয়ক শাস্ত্রীয় গ্রন্থে চর্যাপদের সাংগীতিক-ঐতিহ্যের পরিচয় লভ্য। প্রাচীনকালের ইতিহাসগ্রন্থ কহলন পণ্ডিতের *রাজতঙ্গিণী*, সন্ধ্যাকরনন্দীর *রামচরিত* এবং সংগীতশাস্ত্র শার্ঙ্গদেবের *সংগীত-রত্নাকর*, চালুক্যরাজ হরিপালের *সংগীত-সুধাকর* প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্য ও সংজ্ঞাসূত্রের আলোকে এই প্রবন্ধে প্রাচীন বাংলার সাংগীতিক ঐতিহ্য হিসেবে চর্যাপদের সাংগীতিক পরিবেশন-পদ্ধতি অন্বেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি নেপালে চর্চিত চর্যার সাংগীতিক-ঐতিহ্য সম্পর্কে কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। একই সাথে বাংলাদেশের ভাবসাধকদের তৎপরতায় প্রাচীন বাংলার চর্যাপদের গানের পুনর্জাগরণের ইতিহাস ও বিভিন্ন তৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিভিন্ন কাল-পর্বে চর্যাপদের সাংগীতিক পরিবেশনের কিছু তথ্য সংকলিত হয়েছে। সার্বিক বিচারে প্রাচীন বাংলার সংগীত-ঐতিহ্য হিসেবে চর্যাপদের সাংগীতিক উপস্থাপন-পদ্ধতির পূর্বাপর ইতিহাস গ্রন্থন এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

মূলশব্দ

চর্যাপদ, চর্যাগীতি, চর্যাগীতিকা, বৌদ্ধ গান, চর্যাপদের গানের পুনর্জাগরণ, চর্য্যাচর্যবিনিশ্চয়, বাউল, পৌণ্ড্রবর্ধন, সোমপুর মহাবিহার, পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার।

প্রাচীনকালের ভারত উপমহাদেশে বাংলার সংগীত-ঐতিহ্যের একটি বিশেষ স্থান ছিল। এর প্রামাণ রয়েছে শার্ঙ্গদেব, কহলন, সন্ধ্যাকরনন্দী প্রমুখ বিরচিত বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণনায়। এমনকি বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের বিভিন্ন কবির বর্ণনাতেও প্রাচীন বাংলার সংগীত-ঐতিহ্যের পরিচয় রয়েছে। চর্যার প্রতিটি পদের যুগল-পঙ্ক্তির অন্তে 'ধ্রু' তথা ধ্রুবপদের ব্যবহার, বেশ কয়েকটি পদে সংগীত পরিবেশন-প্রসঙ্গ ও প্রতিটি পদের শীর্ষে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ রয়েছে। এ সকল দৃষ্টান্ত-সূত্রে অধিকাংশ গবেষক চর্যাপদকে প্রাচীন বাংলার একটি গানের সংকলন হিসেবে বিবেচনা করেন। একই কারণে প্রথম থেকেই বাঙালি ও অবাঙালি গবেষকগণ আদি চর্যাপদের সংকলন-সম্পাদনায় এবং গবেষণামূলক গ্রন্থ-প্রণয়নে 'গান', 'গীতি', 'গীতিকা' প্রভৃতি শব্দসহযোগে গ্রন্থ-শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন; যথা–*হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* (হরপ্রসাদ ১৯১৬), *Buddhist Mystic Songs* (Shahidullah 1940), *চর্যাগীতি-পদাবলী* (সুকুমার ১৯৫৬), *Caryāgīti-kosa of Buddhist Siddha* (Bagchi. Shastri 1956), *An anthology of Buddhist Trantric Songs: A Study of Caryā-gīti* (Kvrerne 1977), *Caryāgītikoṣa* (Sen 1977), *চর্যাগীতি-কোষ* (নীলরতন ১৯৭৮), *চর্যাগীতিকা* (সৈয়দ আলী ১৯৮৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

চর্যাপদের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার থেকে শুরু করে চর্যাপদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম-সাধনা, দার্শনিক ভিত্তির পাশাপাশি এর সাংগীতিক উপস্থাপনার স্বরূপ নির্ণয়ন সম্পর্কিত গবেষণার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। কেননা, ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে নেপাল থেকে চর্যাপদের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কারের পর ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হতে সরোজবজ্রের 'দোহাকোষ', কাহ্নপাদের 'দোহাকোষ' ও 'ডাকার্ণব'সহ *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* শীর্ষক গ্রন্থে তিনিই প্রথম 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' পাণ্ডুলিপি সাংগীতিক উপস্থাপনার স্বরূপ সম্পর্কে 'কীর্ত্তনের গান' বলে মন্তব্য করেন (হরপ্রসাদ ১৯১৬: ৪)। শুধু তাই নয়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংকলনভুক্ত 'দোহাকোষ' ভিন্ন 'চর্য্যাচার্যবিনিশ্চয়' তথা চর্যাপদগুলোকে গ্রন্থ-শিরোনামের মাধ্যমে 'বৌদ্ধগান' হিসেবে পরিচয় প্রদান করেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র পর্যবেক্ষণে এ 'বৌদ্ধগানগুলিই পরবর্তী কালের বৈষ্ণব মহাজন পদাবলি ও মুসলমানি মারফতী গানের পূর্বরূপ (proto-type)। এক সময় নাথগণের চর্যাগীতি সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল' (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ২০০৬: ১৮)। অন্যদিকে শার্ঙ্গদেব *সংগীত-রত্নাকর* গ্রন্থে বিপ্রকীর্ণপ্রবন্ধ গীত তথা চর্যাগীতি সম্বন্ধে বলেছেন, 'অধ্যাত্মগোচরা চর্যা' অর্থাৎ, অধ্যাত্ম-সাধনায় বজ্রযানী বৌদ্ধ-যোগীরা চর্যাগান পরিবেশন করতেন (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ১৯৬১: ৪০৪)। এ সকল দৃষ্টান্ত থেকে প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে বাংলার সংগীত-ঐতিহ্যের যেমন বিস্তৃত অবস্থান ও চর্চার ক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, তেমনি চর্যার সাংগীতিক-ঐতিহ্য সম্পর্কেও ধারণা লাভ করা যায়।

চর্যা-চর্চার ঐতিহ্যিক কেন্দ্রসমূহের মধ্যে প্রাচীন বাংলার সোমপুর মহাবিহার (ঐতিহাসিক পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার) উল্লেখযোগ্য। কেননা, বিভিন্ন সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই প্রাচীন মহাবিহারে চর্যাপদের প্রসিদ্ধ কবি কাহ্নপা (কাহ্নুপা), বিরূপা প্রমুখ চর্যাপদের কাব্যসংগীত রচনা ও চর্চার পাশাপাশি হেবজ্র সাধন-ভজন করতেন (অলকা ১৯৯৮: ১১-১৫ ও ৪২-৪৫)।

এ ছাড়া, ঐতিহাসিক পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে প্রাপ্ত বিভিন্ন স্থাপনা, পোড়ামাটির ফলক, ভাস্কর্য এবং চর্যার বিভিন্ন পদে লভ্য সংগীত, নৃত্য ও নাট্য পরিবেশনার চিত্র ও বর্ণনা দৃষ্টেও বিষয়টি প্রামাণিত হয়েছে (সাইমন ২০০৭: ১৫-৩০)।

১ প্রাচীন বাংলার সংগীত-ঐতিহ্য

প্রাচীনকালে সোমপুর মহাবিহারের নিকটবর্তী 'পৌণ্ড্রবর্ধন' তথা বরেন্দ্র অঞ্চল ছিল সংগীত-নৃত্য চর্চা ও সাধনার জন্য প্রসিদ্ধ।

১.১ কহলন পণ্ডিত কর্তৃক **১১৪৯-১১৫০** খ্রিষ্টাব্দে বিরচিত *রাজতরঙ্গিণী* গ্রন্থে পৌণ্ড্রবর্ধনে সংগীত-নৃত্য ঐতিহ্যের একটি বর্ণনা রয়েছে (রমেশচন্দ্র ১৩৬৭: ৩)। কহলনের ভাষায় *রাজতরঙ্গিণী* থেকে প্রাসঙ্গিক পাঠ নিম্নরূপ—

> গৌড়রাজাশ্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাখ্যেন ভুভুজা।
> প্রবিবেশ ক্রমেনাথ নগরং পৌণ্ড্রবর্ধনম্॥
> তস্মিন্সৌরাজ্য রম্যাভিঃ প্রীতঃ পৌরবিভূতিভিঃ।
> লাস্যং স দ্রষ্টুমবিশৎ কার্ত্তিকেয়নিকেতনম্॥
> ভরতানুগমালক্ষ্য নৃত্ত্যগীতাদি শাস্ত্রবিৎ।
> ততো দেব গৃহদ্বারশিলামধ্যাস্ত স ক্ষণম্॥
> তেজোবিশেষচকিতৈর্জনৈঃ পরিহৃতান্তিকম্।
> নর্তকী কমলানাম কান্তিমন্তং দদর্শতম্॥
> ... ...
> তথা জনিতদাক্ষিণাস্তৈ স্তৈর্মধুরভাষিতৈঃ।
> সখ্যাঃ সমাপ্তনৃত্তয়া নিন্যে স বসতিং শনৈঃ॥[১] (রাজ্যেশ্বর ১৯৫৩: ২৩-২৪)

উপর্যুক্ত সংস্কৃতপাঠের বর্ণনা হতে জানা যায়, অষ্টম শতাব্দীতে কাশ্মিরাধিপতি ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় ছদ্মবেশে প্রাচীন বাংলার পৌণ্ড্রবর্ধন নর্তকী কমলার গৃহে আশ্রয় নেন। এই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে ইতিহাসকার লিখেছেন, 'পৌণ্ড্রবর্ধনের বিরাট কার্তিকেয় মন্দিরে সে কালের প্রথানুসারে উচ্চাঙ্গের নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠিত হতো এবং বহু নর্তকী এই মন্দিরে নিযুক্ত ছিলেন। কমলা ছিলেন এঁদের মধ্যে রূপে গুণে শ্রেষ্ঠা'। (রাজ্যেশ্বর ১৯৫৩: ২৩)

*রাজতরঙ্গিণী*র বর্ণনায় কহলন পৌণ্ড্রবর্ধনের কার্তিকেয় মন্দিরে প্রচলিত যে সংগীতানুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছেন, তা ছিল 'ভরতানুগ', অর্থাৎ নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুণির মত অনুযায়ী। এতে প্রামাণিত হয়, অষ্টম শতাব্দীর বাংলায় ভরতোক্ত পদ্ধতির সংগীত-নৃত্য-নাট্যরীতির প্রচলন ছিল। তবে এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন, প্রাচীন বাংলার সংগীত-নৃত্য-নাট্যরীতি চর্চার এ ধরনের ঐতিহ্য শুধু রাজদরবার বা রাজমন্দিরকেন্দ্রিক ছিল, এ রকম ভাবার সংগত কোনো কারণ নেই। কেননা ইতিহাসকারের বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, ৭৫০ থেকে ১১৫৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির অংশ হিসেবে সংগীত চর্চার ঐতিহ্য বাংলার জনসাধারণের মধ্যে অকৃত্রিম আবেগে বিস্তৃত ছিল (রাজ্যেশ্বর ১৯৫৩: ১৭)। বিভিন্ন গ্রন্থে এর প্রমাণ রয়েছে।

১.২ সন্ধ্যাকরনন্দী বিরচিত *রামচরিত* কাব্যে বর্ণনা করেছেন, পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা রাম পালের রাজধানী রামাবতী নগরের সংগীত চর্চার খ্যাতি নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভৌগোলিক দিক থেকে প্রাচীন রামাবতী নগরের অবস্থান ছিল বরেন্দ্র অঞ্চলের মধ্যে। *রামচরিত* গ্রন্থের শ্লোকে এ বিষয়ের প্রমাণ রয়েছে। যেমন, রামাবতীনগর সম্পর্কে *রামচরিতে*র একটি শ্লোক হলো—

> অমরাবতীসমানানেকবরেন্দ্রীকৃতাতঙ্কাম্।
> সুমনোভিরভিব্যাপ্তাং নিষ্প্রত্যূহামৃতেন পরিপূর্ণৈঃ॥ (৩/২৯) (রাধাগোবিন্দ ১৯৫৩: ৯৩)

অর্থাৎ, অমরাবতীসদৃশ রামাবতীনগর বরেন্দ্রদেশীয়গণের মুরজবাদ্যে মুখরিত হয়ে উঠত এবং সেখানে সুধীগণ নির্বিবাদে প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাস করতেন (রাজ্যেশ্বর ১৯৫৩: ৩১)।[২] শ্লোকটির টীকাতে বর্ণিত হয়েছে,

> রামাবতীং কীদৃশীম্? অমরাবত্যা সমানাং তথা অনেকে বরেন্দ্রাং কৃতা অভ্যস্তা বরেন্দ্র্যা বৈশিষ্ট্যভূতা ইত্যর্থঃ আতঙ্কাঃ মুরজধ্বনয়ো যস্যাং তাম্ নিষ্প্রত্যূহাং নিরস্তবিপ্লবাং ঋতেন সত্যেন পরিপূর্ণৈঃ অথবা নিষ্প্রত্যূহামৃতেন নিষ্প্রত্যূহং প্রতিবন্ধকবর্জিতং যৎ অমৃতং যাচঞ্রাং বিনাপি লব্ধং দানং তৈনৈব তৃপ্তিমাপন্নৈঃ সুমনোভিঃ বুধৈঃ অভিব্যাপ্তাম্ অভিতো ব্যাপ্তাম্।[৩] (মঞ্জুলা ২০২১: ১০৫)

টীকাটির অর্থ দিতে গিয়ে মঞ্জুলা চৌধুরী *সন্ধ্যাকরনন্দী বিরচিতম্ রামচরিতম্* গ্রন্থে লিখেছেন—

> রামপাল তাঁর রাজধানী রামাবতীকে অমরাবতীর মত করে গড়ে তুললেন। এই নগরীর অধিবাসীরা সত্য ও ধর্মের পথে দৃঢ় থাকত, অনেকে ধরনের সংগীত শিক্ষা করত এবং কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতায় ভয় পেত না। সেখানকার মানুষেরা ছিল শিক্ষিত ও সম্পদশালী। (২০২১: ১০৫)

অন্যদিকে বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম থেকে প্রকাশিত *The Rāmacaritam of Sandhyākaranandin* শীর্ষক গ্রন্থে টীকাটির ইংরেজি অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় রামপালের রাজধানী রামাবতীর সংগীত-সংস্কৃতির ঐতিহ্য সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে যে,

> He (Rāmapala) built the city of (Rāmāvatī) which rivalled Amarāvatī, which was resonant with the music of tabor of many varietiies that was (specially) practised in Varendrī, which was peopled by learned men devoted to truth, an wich was without any obstacles (or by learned men who were content with gifts, unsolicited and unobstructed). (Majumdar 1939: 101)

অর্থাৎ, রামপালের আমলে বরেন্দ্র এলাকায় প্রতিষ্ঠিত রামাবতী নগরের সংগীতের ঐতিহ্য জনগণের মধ্যে বেশ ভালোভাবেই প্রচলিত ছিল। প্রশ্ন আসতে পারে, এই সংগীত সংস্কৃতির ঐতিহ্যপ্রেমী রামাবতী নগরটি বরেন্দ্র অঞ্চলের কোথায় অবস্থিত ছিল। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, বাংলাদেশের গবেষকদের কেউ কেউ প্রত্নতাত্ত্বিক বিচারে, বরেন্দ্রীর পাল বংশীয় রাজা রামপাল (১০৮২-১১২৪) প্রতিষ্ঠিত রাজধানী রামাবতীকে নওগাঁ জেলার অধীন ছিল বলে অনুমান করেন[৪] (মোহা. মোশাররফ ২০১২: ৫৮)।

১.৩ প্রাচীন বাংলার পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। পাল রাজাদের সময়ে অধিকাংশ জনসাধারণ মহাযানী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও বেশ কিছু সাধক কবি মহাযানের শাখা মন্ত্রযান এবং মন্ত্রযান থেকে উদ্ভুত বজ্রযান মতের সাধন-পদ্ধতি অবলম্বনে সাহিত্য রচনা করেন।[৫] পরবর্তীকালে যার কিছু অংশের তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ তিব্বতের বৌদ্ধবিহারে স্থান করে নেয়। জানা যায়, সে সময়কার বজ্রযান, কালচক্রযান, মন্ত্রযান, তান্ত্রিক বৌদ্ধ পণ্ডিত ও অন্যান্য আচার্যরা তাঁদের গ্রন্থে তন্ত্র-সাধনার অনুশীলনসহ বজ্রযানী সাধন-পদ্ধতি নির্ভর বহু দোহা ও গীত রচনা করেন (জ্যোতি ২০০৮: ১৩২-১৩৩)। এতে অনুমিত হয় যে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের সময়ে বাংলা ছিল সংগীত-সংস্কৃতির উর্বর একটি ক্ষেত্র।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাচীন বাংলায় পাল আমলে বরেন্দ্র অঞ্চলে সংগীত ঐতিহ্যের সর্বব্যাপী চর্চার নানাবিধ প্রমাণ রয়েছে সন্ধ্যাকরনন্দী বিরচিত *রামচরিতম্* কাব্যে। পাশাপাশি ভারতের মালদহ জেলার অন্তর্গত খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের একটি শ্লোকে বরেন্দ্র অঞ্চলের সংগীত ঐতিহ্য সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। শ্লোকটি হলো—

> গোপৈঃ সীম্নি বনেচরৈর্বনভুবি গ্রামোপকণ্ঠে জনৈঃ
> ক্রীড়ন্তি প্রতিচত্বরং শিশুগণৈঃ প্রত্যাপণং মানপৈঃ
> লীলাবেশ্মনি পঞ্জরোদর শুকৈরুদ্গীতমাত্মস্তবং
> যস্যাকর্ণয়তস্ত্রপা-বিবলিতা-নম্রং সদৈবাননং॥ (রাজ্যেশ্বর ১৯৫৩: ৩২)

তাম্রশাসনের উপর্যুক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় জানা যায়, বরেন্দ্র অঞ্চলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে পাল রাজাদের কীর্তিগাথা গীত আকারে প্রচলিত ছিল। সে সময়ের সৃষ্টিশীল লোককবি ও গায়কেরা পাল রাজাদের প্রশস্তিমূলক গীত রচনা করে গাইতেন। 'এই সব গান গ্রাম রাখালেরা মাঠে মাঠে গেয়ে বেড়াত', বণিকগণ অবসর সময়ে 'বিপণীতে গাইতেন', 'ছোটো ছোটো বালক-বালিকারা' গৃহাঙ্গনে 'এই গান অভ্যাস করত', 'এমনকি বিলাসগৃহের পিঞ্জরস্থিত পোষা শুকপাখিরাও এই গানগুলি আবৃত্তি করতে পারত' (রাজ্যেশ্বর ১৯৫৩: ৩২-৩৩)। এর অর্থ, সে সময় বরেন্দ্রভূমি এলাকার সংগীত-ঐতিহ্য অত্যন্ত প্রাণবন্ত, সমৃদ্ধ ও সর্বব্যাপী ছিল।

এই সংগীত-ঐতিহ্যের মধ্যে পাল রাজাদের প্রশস্তিমূলক গীত রচনা ও পরিবেশনা একসময় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বরেন্দ্রভূমির প্রায় প্রতিটি গৃহে পাল রাজাদের মধ্যে মহীপালের গীত এতই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল যে তা কয়েক শতাব্দীব্যাপী চর্চিত ছিল (রাজ্যেশ্বর ১৯৫৩: ৩৩)। এর প্রমাণ পাওয়া যায়, খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাসের রচনায়, তিনি তৎকালের সমাজে প্রচলিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন—

> কৃষ্ণ-যাত্রা, অহোরাত্রি কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
> ইহার উদ্দেশ নাহি জানে কোন জন॥
> 'ধর্ম্ম কর্ম্ম' লোক সব এই মাত্র জানে।
> মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
> দেবতা জানেন সবে 'ষষ্ঠী' 'বিষহরি'।
> তাহারে সেবেন সবে মহা-দম্ভ করি॥
> ... ...
> যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত।

ইহা শুনিবারে সর্ব্বলোক আনন্দিত॥ (বৃন্দাবন ৪৪২: ৯৭৮-৯৭৯)

এ ধরনের বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয়, মধ্যযুগের বাংলায় গ্রামের সাধারণ জনগণের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের গানের মতো পাল রাজাদের প্রশস্তিমূলক গীতও প্রচলিত ছিল। এ ছাড়া, বাংলা প্রবাদেও মহীপালের গীতের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, যথা: 'ধান ভানতে মহীপালের গীত', 'ঘুঁটে কাঠ কুড়াতে গেনু, মহীপালের গীত পেনু' (সুশীলকুমার ১৩৫২: ৮১)। এতে প্রমাণিত হয়, পালরাজা মহীপালের মাহাত্ম্য-প্রকাশক নানা ধরনের গীত একসময় বাংলার সর্বত্র অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। যে কারণে মধ্যযুগের জীবনীকাব্য থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত বাংলা প্রবাদের মধ্যেও এই গীত বা গানের কথা বারবার উল্লেখিত হয়েছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার সাহিত্যিক-নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করলে বাংলার সংগীত-ঐতিহ্যের আরো বহুবিধ প্রমাণ পাওয়া যায়। যা বিবেচনায় নিয়ে ইতিহাসকার উল্লেখ করেন, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় হোলি উৎসব উপলক্ষে 'চর্চরি বা চাঁচর'[৬] এবং 'দেহতত্ত্ব ও অধ্যাত্মবিষয়ক চর্যাগীতি' বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে গীত হতো[৭] (রাজ্যেশ্বর ১৯৫৩: ৩৩)। এক্ষেত্রে বাংলার সংগীত-ঐতিহ্যের ভেতর চর্যাগীতি পরিবেশন সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

২ চর্যাপদের সাংগীতিক পরিবেশনরীতি

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন—

> ১৯০৭ সালে আবার নেপালে গিয়া আমি কয়েকখানি পুথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়', উহাতে কতকগুলি কীর্ত্তনের গান আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের মত, গানের নাম 'চর্য্যাপদ'। (হরপ্রসাদ ১৯১৬: ৪)

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাথমিক পর্যবেক্ষণেই চর্যাপদগুলোকে 'কীর্ত্তনের গান' বা 'বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের মতো গান' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি আরো উল্লেখ করেছিলেন যে, 'সে কালেও সংকীর্ত্তন ছিল এবং সংকীর্ত্তনের গানগুলিকে পদেই বলিত। তবে এখনকার কীর্ত্তনের পদকে শুধু পদ বলে, তখন "চর্য্যাপদ" বলিত' (হরপ্রসাদ ১৯১৬: ১৬)। চর্যাপদকে 'কীর্ত্তনের গান' মনে করার একটা যুক্তিযুক্ত কারণ হলো, চর্যার প্রতিটি পদের শীর্ষে যে সব রাগের উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি রাগ কীর্তনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (রাজ্যেশ্বর ১৯৫৩: ৪১)। কিন্তু চর্যাপদ কীভাবে গাওয়া হতো তা উপর্যুক্ত মন্তব্য থেকে সঠিকভাবে বোঝার কোনো উপায় নেই। তবে, শার্ঙ্গদেবের *সংগীত-রত্নাকর*, চালুক্যরাজ হরিপালের *সংগীত-সুধাকর* প্রভৃতি গ্রন্থের বর্ণনা হতে চর্যাপদের আকৃতি ও পরিবেশনরীতি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।

শার্ঙ্গদেব ১২১০-১২৪৭ খ্রিষ্টাব্দে *সংগীত-রত্নাকর* গ্রন্থটি রচনা করেন (রাজ্যেশ্বর ১৯৫৩: ৪৪)। এক্ষেত্রে ধারণা করা হয়, চর্যাপদ *সংগীত-রত্নাকর* রচনার কয়েক শত বছর আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। শার্ঙ্গদেব এবং সিংহভূপাল-কল্লিনাথের মধ্যবর্তীকালে ১৩০৯-১৩১২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হরিপালের *সংগীত-সুধাকরে* (উৎপলা ১৯৭১: ৬-৭) চর্যাপদের সাংগীতিক পরিবেশন-প্রকৃতির বর্ণনা লভ্য। *সংগীত-রত্নাকর* ও *সংগীত-সুধাকরে* চর্যাপদের গায়নরীতির উল্লেখ ও বর্ণনা দেখে সংগীত-গবেষকদের অনুমান, চর্যাগান শার্ঙ্গদেবের সময় 'বেশ

ভালোভাবেই প্রচলিত ছিল এবং পরবর্তীকালেও বহুদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, মহারাজা সিংহভূপাল (চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ) এবং কল্লিনাথের (পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ) টীকাই তার প্রমাণ' (রাজ্যেশ্বর ১৯৫৩: ৪৪)। উল্লেখ্য, মহারাজা সিংহভূপাল খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং কল্লিনাথ পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ বর্তমান ছিলেন। এক্ষেত্রে অনুমান করা যায়, চর্যাপদের সাংগীতিক ঐতিহ্য টীকাকারদের কালেও প্রচলিত ছিল। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসকারের যুক্তি হলো, চর্যাপদের গানের পরিবেশনরীতি ঐতিহ্য যদি টীকাকারদের সময়ে বিলুপ্ত হয়ে যেত তাহলে টীকাতে চর্যার উল্লেখ থাকত না। এ ছাড়া, আনুমানিক ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত বেঙ্কটমখি বিরচিত *চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকা* গ্রন্থে চর্যার উল্লেখ থাকাতে প্রমাণিত হয়, সপ্তদশ শতকের প্রথমদিক পর্যন্ত চর্যাপদের পরিবেশনরীতি বাংলায় প্রচলিত ছিল (রাজ্যেশ্বর ১৯৫৩: ৪৪-৪৫)। এক্ষেত্রে চর্যার ঐতিহ্যিক পরিবেশনের দীর্ঘসময়ের ইতিহাস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

চর্যাগানের জনপ্রিয়তা, লোকায়ত সংস্কৃতিতে চর্যার গ্রহণযোগ্যতা, চর্চা ও বিস্তার সম্পর্কে রাজ্যেশ্বর মিত্র লিখেছেন, 'অনেকের ধারণা চর্যাগান গান খুব অল্প লোকের মধ্যে সংকীর্ণভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয় নতুবা *সংগীত-রত্নাকরে* চর্যাগানের লক্ষণসমেত সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকত না। এমনকি কল্লিনাথের টীকাতেও চর্যাগানের পরিবেশনরীতি সম্বন্ধে পরিষ্কার বর্ণনা থাকত না। চর্যাগান যে আঞ্চলিক গীত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। শুধু তাই নয়, সংগীতের ইতিহাসে গান হিসেবে চর্যাপদের বিশেষ মূল্য এবং স্বীকৃত ছিল। আসলে, প্রাচীনকালের ভারতীয় সংগীতের মধ্যে বাংলা গানের যে একটা স্থান ছিল, চর্যাপদ বা চর্যাগীতিই তার আদর্শ নিদর্শন (রাজ্যেশ্বর ১৯৫৩: ৪৫)। ইতিহাসকারের এই বর্ণনায় থেকে চর্যাপদের লোকপ্রিয়তা ও আঞ্চলিক গীত রূপ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। তারপরও দুটি জিজ্ঞাসা থেকে যায়: ১. চর্যাপদের সাংগীতিক গঠন-শৈলী কেমন ছিল, এবং ২. চর্যাপদের গান কী রূপে পরিবেশিত হতো? এই প্রশ্ন দুটির উত্তর রয়েছে যথাক্রমে *মানসোল্লাস*, সংগীত-শাস্ত্রগ্রন্থ *সংগীত-রত্নাকর*, *সংগীত-সুধাকর* প্রভৃতি গ্রন্থে। এর মধ্যে *মানসোল্লাস* হলো সংস্কৃত কোষগ্রন্থ এবং *সংগীত-রত্নাকর* ও *সংগীত-সুধাকর* হলো সংগীত-সম্পর্কিত শাস্ত্রগ্রন্থ।

সংস্কৃত কোষগ্রন্থ *মানসোল্লাস* ১১২৯ খ্রিষ্টাব্দে সংকলিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে চর্যাগানের লক্ষণ সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে—

> অর্থশ্চাধ্যত্মিকঃ প্রায়ঃ পাদত্বিতয়শোভনঃ
> উত্তরার্ধে ভবেদেবং চর্যা সা তু নিগদ্যতে॥ (সুকুমার ১৯৬৬: ১৫৫)

সুকুমার সেন এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় জানিয়েছেন, 'অর্থ অধ্যাত্মবিষয়ক, মিল আছে, দুই তিন জোড়া ছত্র। দ্বিতীয় অংশেও এমনি। তাহাকে বলে চর্যা।'[৮] (সুকুমার ১৯৬৬: ১৫৫)

২.১ চর্যাপদের সাংগীতিক প্রকৃতি এবং পরিবেশনরীতি সম্পর্কে সর্বাধিক বর্ণনা পাওয়া যায় শার্ঙ্গদেবের *সংগীত-রত্নাকরে*। এই গ্রন্থের বর্ণনা থেকে চর্যার ছন্দ ও পরিবেশন-পদ্ধতি সম্পর্কে যেমন বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায়, তেমনি চর্যাপদ-উপস্থাপনার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। যেমন, *সংগীত-রত্নাকরের* প্রবন্ধ অধ্যায়ে শার্ঙ্গদেব লিখেছেন—

> পদ্ধড়ীপ্রভৃতিচ্ছন্দাঃ পাদান্তপ্রাসশোভিতাঃ।

> অধ্যাত্মগোচরা চর্যাস্যাদ্ দ্বিতীয়াদিতালতঃ॥
> সা দ্বিধা ছন্দসঃ পূর্ত্যা পূর্ণাপূর্ণাত্বপূর্তিতঃ।
> সমধ্রুবা চ বিষমধ্রুবেত্যেষা পুনর্দ্বিধা॥
> আবৃত্ত্যা সর্বপাদানাং গীয়তে সা ধ্রুবস্য বা।[৯] (নীলরতন ২০০১: ৫৫)

এর অর্থ, প্রতিটি পদের শেষে অনুপ্রাসযুক্ত পদ্ধড়ী প্রভৃতি ছন্দে রচিত, আধ্যাত্মিক বিষয়ীকৃত, দ্বিতীয় প্রভৃতি তালযুক্ত যে গীতি তাকে চর্যা বলা হয়। এই গীতি দুই প্রকার, যে গুলিতে ছন্দের প্রাধান্য রয়েছে সেগুলিকে বলা হয় পূর্ণ এবং যেগুলিতে ছন্দের প্রাধান্য নেই সেগুলিকে অপূর্ণ বলা হয়। এ ছাড়াও দুটি প্রকারভেদ আছে, যথা–একটি সমধ্রুবা, অন্যটি অসমধ্রুবা জাতীয়। যখন সবগুলি পদ সমকণ্ঠে আবৃত্তি করে গাওয়া হয় তখন একে বলা হয় সমধ্রুবা; এবং যখন কেবলমাত্র ধ্রুব অংশটুকু সম্মেলক গাওয়া হয় তখন বলা হয় বিষমধ্রুবা (রাজ্যেশ্বর ১৯৫৩: ৪৫-৪৬)।[১০]

প্রায় একই ধরনের বর্ণনা লাভ করা যায়, চালুক্যবংশীয় নৃপতি (অভিনবপুররাজ) হরিপাল বিরচিত *সংগীত-সুধাকরে*, এতে বর্ণিত হয়েছে যে—

> প্রান্তপ্রাসা নিবদ্ধা স্যাৎপ্রবন্ধৈঃ পদ্ধড়ীর্মুখৈঃ।
> দ্বিতীয় প্রমুখৈস্তর্গেয়াধ্যাত্মোপযোগিণী।
> যোগিভির্গীয়তে চর্যা প্রকারৈবহুভিস্বস্যে॥ (রাজ্যেশ্বর ১৩৬৬: ৬)

এই বর্ণনার সাথে *সংগীত-রত্নাকরের* বর্ণনার তেমন কোনো পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। তবে, চর্যাগান যে যোগীরাই গাইতেন সেটা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য চর্যার বেশ কিছু পদে 'যোগী' শব্দের প্রয়োগ রয়েছে। যেমন, চর্যার ১১ সংখ্যক পদে আছে, 'কাহ্নু কাপালী যোগী পইঠ অচারে', ৩৭ সংখ্যক পদে আছে, 'অনুভব সহজ মা ভোলরে জোঈ [যোগী]।' (রাজ্যেশ্বর ১৩৬৬: ৬)

শার্ঙ্গদেবকৃত চর্যা-সম্পর্কিত সংজ্ঞাটির সূত্রে *চর্যাপদের ছন্দপরিচয়* শীর্ষক গ্রন্থে নীলরতন সেন লিখেছেন—

> এই [শার্ঙ্গদেবকৃত] সংজ্ঞায় অনুমিত হচ্ছে, বাংলা চর্যাগীতিগুলির মধ্যে পূর্ণা অপূর্ণা দুই রীতিরই গান রয়েছে। সম-অসম বিভাগের বিচারে এই গীতগুলিকে সমধ্রুবা পদ্ধড়ীবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। মাঝে মাঝে কয়েকটি চর্যাগীতে যে ছন্দগত অত্যধিক শিথিলতা প্রকাশ পেয়েছে সেখানেই অপূর্ণা পদ্ধড়ীগীতের নিদর্শন ফুটে উঠেছে মনে হয়। তবে বহু গানেই বেশ স্বচ্ছন্দ ষোলমাত্রার (চতুর্মাত্রা-স্পন্দনসহ) চাল প্রকাশ পেয়েছে,—সেগুলিকেই পূর্ণা পদ্ধড়ী বলা যেতে পারে। (নীলরতন ১৯৭৪: ৫৫-৫৬)

উল্লেখ্য, *সংগীত-রত্নাকরের* সংজ্ঞার্থমূলক শ্লোকটির ব্যাখ্যায় পরবর্তীকালের টীকাকার কল্লিনাথ এবং সিংহভূপাল চর্যাপদের পরিবেশন-পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। যেমন, *সংগীত-রত্নাকরের* অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর টীকাকার সিংহভূপাল শ্লোকটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় লিখেছেন—

> চর্যাং লক্ষয়তি—পদ্ধড়ীতি। পদ্ধড়ীতি রাহড়ীমুখ্যানি ছন্দাংসি। যস্যাঃ পাদানামন্তেহনুপ্রাসযুক্তঃ, অধ্যাত্মবাচকৈঃ পদৈরুপনিবদ্ধা সা চর্যা দ্বিতীয়াদিতালৈঃ সা কর্তব্যা। তৃতীয়াবহুবচনার্থে

> তলপ্রত্যয়ঃ। সা দ্বিপ্রকারা—ছন্দঃপূর্তৌ পূর্ণঃ, অপূর্তাবপূর্ণঃ। পুনরপি দ্বিধা; সর্বেষাং পাদানামাবৃত্তৌ সমধ্রুবা, ধ্রুবস্যৈবাবৃত্ত্যে বিষমধ্রুবেতি। ইতি চর্যা-প্রবন্ধঃ॥ (রাজ্যেশ্বর ১৯৫৩: ৪৬)

টীকাটির অর্থ করলে দেখা যায়, চর্যার লক্ষণ বা গঠনশৈলী হলো—পদ্ধড়ী। পদ্ধড়ীর রূপটি মূলত 'রাহড়ী-মুখ্যানি' বা বহু পাদবিশিষ্ট ছন্দের অনুরূপ। আসলে, যে পদ বা পঙ্ক্তিগুলোর শেষে অনুপ্রাস যুক্ত থাকে এবং যেগুলো আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু প্রকাশ করে, সেটি চর্যা নামে পরিচিত। এটি দ্বিতীয়াদি তাল (ছন্দ) অনুসারে হওয়া উচিত। তৃতীয়া বহু বচনের অর্থ প্রকাশে 'তল' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। চর্যাসমূহ দুই প্রকারের হতে পারে: ছন্দ পূর্ণ হলে পূর্ণ এবং অপূর্ণ হলে অপূর্ণ। এটিও আবার দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে: সব পাদ যদি একইভাবে পুনরাবৃত্ত হয় তবে সেটি সমধ্রুবা এবং যদি কেবল ধ্রুব পাদ পুনরাবৃত্ত হয় তবে সেটি বিষমধ্রুব। এভাবে চর্যা-প্রবন্ধ রচিত হয়।

শার্ঙ্গদেবকৃত *সংগীত-রত্নাকরের* পরবর্তীকালের টীকাকার কল্লিনাথ শ্লোকটির আরো বিস্তৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে উল্লিখিত চর্যার প্রকৃতি করেছেন। তিনি লিখেছেন—

> অথ চর্যাং লক্ষয়তি পদ্ধড়ীত্যাদিনা। পদ্ধড়ী প্রভৃতি ছন্দা ইতি। পদ্ধড়ী প্রভৃতীনি ছন্দাংসি যস্যাঃ সা। পদ্ধড়ী প্রভৃতিযু ছন্দঃ স্বেকেন বদ্ধেতার্থঃ। পদ্ধড়ীছন্দোলক্ষণমনন্তরমেব বক্ষ্যতে। অধ্যাত্মগোচরেতি। অধ্যাত্মং বিষয়ীকৃত্য প্রবৃত্তেত্যর্থঃ। দ্বিতীয়াদিতালতঃ ইতি। দ্বৌ লৌ দ্বিতীয়কঃ ইতি দ্বিতীয়তালস্য লক্ষণং বক্ষ্যতে। আদিশব্দেন তৎসম-মাত্রোহন্যোহপি তালো গৃহতে। নমধ্রুবেতি। সম ধ্রুবো যস্যা ইতি বহুব্রীহিঃ। সমশব্দস্য সাপেক্ষত্বাদত্র প্রত্যাসত্ত্যোদ্গ্রাহ এবাপেক্ষতে। তেন ধ্রুবস্যোদ্গ্রাহসমত্বমবগম্যতে। এবং বিষমধ্রুবেত্যত্রাপি ধ্রুবস্যোদ্-গ্রাহাপেক্ষয়া ন্যূনত্বেন বাধিকত্বেন বা বিষমত্বং দ্রষ্টব্যম। আভোগঃ পৃথক্পদৈঃ কর্তব্যঃ তেনায়ং ত্রিধাতুঃ। ছন্দস্তালনিয়মান্নির্যুক্তঃ; পদতালবদ্ধত্বাদ্দ্যঙ্গস্তারাবলী জাতীমান্। (রাজ্যেশ্বর ১৯৫৩: ৪৬)

এই টীকাটির সারকথা হলো, এখানে চর্যার লক্ষণগুলোর মধ্যে পদ্ধড়ী প্রভৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। পদ্ধড়ী প্রভৃতির ছন্দ-রূপের ব্যাখ্যা এখানে লভ্য। পদ্ধড়ী প্রভৃতি ছন্দ যার অন্তর্গত তা স্পষ্ট করা হয়েছে। পদ্ধড়ী ছন্দের লক্ষণগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি আধ্যাত্মিক। অধ্যাত্ম বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এর প্রকৃতি নির্মিত হয়। দ্বিতীয়াদি তাল ও তার লক্ষণগুলো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। আদি শব্দের মাধ্যমে তালকে বোঝানো হচ্ছে, তৎসম বা সম শব্দগুলি দ্বারা তাল বোঝানো হয়েছে। সম ধ্রব বহুব্রীহি সমাস দ্বারা বর্ণনা করা হবে। এখানে সম শব্দটির আপেক্ষিকতা থাকবে। ধ্রুবের সমত্ব বোঝানো হবে এবং বিষমধ্রুব, যেখানে ধ্রুবের অপেক্ষায় বিষমত্ব দেখা যাবে। আভোগ (বিভিন্ন অংশের সংমিশ্রণ) পৃথক পদ দ্বারা করা উচিত, যার মাধ্যমে এটি ত্রিধাতু (তিনটি উপাদান) রূপে তৈরি হবে। ছন্দ এবং তাল নিয়মের থেকে আবদ্ধ; পদতাল বন্ধনের জন্য তারাবলী জাতি থাকবে।[১১]

শার্ঙ্গদেবের মূল শ্লোকের ব্যাখ্যায় সিংহভূপাল ও কল্লিনাথের টীকা দুটির ব্যাখ্যায় চর্যাপদ বা চর্যাগানের ছন্দ ও তাল নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ লভ্য। তবে সব ধরনের ব্যাখ্যা থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, চর্যাপদ পদ্ধড়ী প্রভৃতি ছন্দে পরিবেশন করা হতো।

২.২ চর্যাপদের পরিবেশন-পদ্ধতির স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য পদ্ধড়ী ছন্দ সম্পর্কে ব্যাখ্যা অন্বেষণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রেও প্রধান অবলম্বন শার্ঙ্গদেবের *সংগীত-রত্নাকর* গ্রন্থটি। এই

গ্রন্থের প্রবন্ধাধ্যায়ে চর্যার পরিবেশনরীতির আলোচনার পরেই পদ্ধড়ী জাতীয় গীত সম্পর্কে বর্ণনা লভ্য। শার্ঙ্গদেব লিখেছেন—

> চরণান্তসমপ্রাসা পদ্ধড়ীছন্দসা যুতা।
> বিরুদৈঃ স্বরপাটান্তৈঃ রচিতা পদ্ধড়ী মতা॥ (রাজ্যেশ্বর ১৯৫৩: ৪৭)

অনুবাদক সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই শ্লোকটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন—

> যে প্রবন্ধ পদ্ধড়ী ছন্দে নিবদ্ধ যাহার প্রতিপাদের শেষে একরূপ অনুপ্রাস থাকে এবং যাহার প্রথমার্ধ বিরুদদ্বারা রচনা করিয়া স্বর প্রয়োগ করিতে হয় এবং দ্বিতীয়ার্ধ বিরুদে রচনা করিয়া পাট প্রয়োগ করিতে হয় তাহা পদ্ধড়ীনামে অভিহিত হয়। (সুরেশচন্দ্র ১৩৭৯: ১৬৬)

অন্যদিকে *সংগীত-রত্নাকরের* ২৯৫ সংখ্যক শ্লোকের কল্লিনাথ টীকায় পদ্ধড়ী ছন্দ বা গীতির ব্যাখ্যায় সুর-তালের মাত্রা বিন্যাস সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। কল্লিনাথের মূল টীকাটি হলো—

> ষোড়শমাত্রাঃ পাদে পাদে।
> যত্র ভবন্তি নিরস্ত বিবাদে॥
> পদ্ধড়িকা জ-গণেন বিমুক্তা।
> চরমগুরুঃ সা সদ্ভিরিহোক্তা॥
> তস্য লক্ষণমুদাহরণং চ। (নীলরতন ১৯৭৪: ৫৬)

টীকাটির অর্থ হলো, 'নির্বিবাদে যেখানে পাদে পাদে ষোলমাত্রা দেওয়া হয়, যে ছন্দ জ-গণ (লঘু-গুরু-লঘু) বিমুক্ত থাকে, এবং অন্ত্যগুরু হয়, তাকে পদ্ধড়ী ছন্দ বলে।' (নীলরতন ১৯৭৪: ৫৬)

বাংলার সংগীত-ইতিহাসকার রাজ্যেশ্বর মিত্রের মতে, এই পদ্ধড়িকা মূলত সংস্কৃত পজ্ঝটিকা ছন্দ। এ ছাড়া তিনি মন্তব্য করেছেন যে, পজ্ঝটিকা ছন্দ অত্যন্ত লোকপ্রিয় ছিল এবং এই ছন্দের রচনা একসময় লোকপ্রিয় সংগীতে পরিণত হয়েছিল (রাজ্যেশ্বর ১৯৫৩: ৪৭)। বিস্তৃত ব্যাখ্যায় জানা যায়, পদ্ধড়ী ছন্দের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এর প্রতি পদে ষোলমাত্রা এবং মধ্যগুরু 'গণ' থাকবে না। অর্থাৎ কল্লিনাথ যাকে বলেছেন, 'জ গণেন বিমুক্তা'। আসলে, গুরু এবং লঘু বর্ণ অনুসারে তিন তিনটি বর্ণে এক একটি 'গণ' হয় (রাজ্যেশ্বর ১৯৫৩: ৪৭)। অন্যত্র তিনি তিনি উল্লেখ করেছেন, সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী সংগীতের ক্ষেত্রে গুরু ও লঘু বর্ণ অনুসারে তিনটি বর্ণের সম্মেলনে এক একটি 'গণ' স্বীকৃত হয়। এ ধরনের আটটি গণ রয়েছে (রাজ্যেশ্বর ১৩৬৬: ৬-৭)। এক্ষেত্রে গণের বর্ণনাত্মক শ্লোকটি উদ্ধৃতি যোগ্য। শ্লোকটি হলো—

> ম স্ত্রিগুরু স্ত্রিলঘুশ্চ নকারো
> ভাদিগুরুঃ পুনরাদি লঘুর্যঃ।
> জো গুরু মধ্যগতো রল মধ্যঃ
> সোহন্তগুরুঃ কথিতোহন্তলঘুস্তঃ॥ (রাজ্যেশ্বর ১৯৫৩: ৪৭)

অর্থাৎ, ম=তিনটি গুরুবর্ণ; ন=তিনটি লঘুবর্ণ; ভ=আদিবর্ণ গুরু, বাকি দুটি লঘু; য=আদিবর্ণ লঘু, বাকি দুটি গুরু; জ=মধ্যবর্ণটি গুরু, প্রথম ও তৃতীয় লঘু; র=মধ্যবর্ণটি লঘু, প্রথম ও তৃতীয় গুরু; স=শেষ বর্ণটি গুরু; ত=শেষ বর্ণটি লঘু (রাজ্যেশ্বর ১৯৫৩: ৪৭-৪৮)। সংগীতশাস্ত্রে এই গণগুলিকে বলা হয় বর্ণগণ। এর মধ্যে পদ্ধড়ী ছন্দে 'জ-গণ'টির প্রয়োগ নিষিদ্ধ। সংগীত-বিশেষজ্ঞের মতে, যেসব বর্ণ ছন্দ-জাতির অন্তর্ভুক্ত সেগুলিতে চারটি মাত্রা নিয়ে চারটি গণ আছে: সর্বগুরু, অন্তগুরু, মধ্যগুরু এবং চতুর্লঘু। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, পদ্ধড়ী ছন্দ ষোল মাত্রায় সম্পূর্ণ। এতে যে চারটি ভাগ আছে তার কোনোটিতেই মধ্যগুরু গণ থাকে না (রাজ্যেশ্বর ১৯৫৩: ৪৭-৪৮)। ছন্দ অনুসারে ভাগ করে চর্যার প্রথম পদটি উল্লেখের মাধ্যমে রাজ্যেশ্বর মিত্র এমন একটি উদাহরণ প্রদান করেছেন যাতে পদ্ধড়ী ছন্দের গঠন স্পষ্ট হয়েছে, উদাহরণটি হলো—

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥

কা—আ—|ত রু ব র|প ন্ চ বি|ডা—ল—|
চ ন্ চল| চী—এ—|প ই ঠো—|কা—ল—॥ (রাজ্যেশ্বর ১৩৬৬: ৭)

এই দৃষ্টান্তে শুধু কাব্যিক ছন্দের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। কাব্যের ছন্দ থেকে সংগীতের তাল আলাদা। আসলে, সংগীতের তাল নিয়ন্ত্রিত ও বিকশিত হয় সুরের সম্প্রসারণ ও সংকোচনে। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত ও সংকলিত চর্যার পদগুলির একটিতেও কোনো তালের উল্লেখ নেই। তা ছাড়া চর্যাপদের প্রতিটি গানের প্রতিটি অংশের ছন্দেও মাত্রার সমতা রক্ষিত হয়নি। যেমন চর্যার প্রথম সংখ্যক পদ থেকে 'পূর্বে যে অংশটুকুর উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতে ছন্দ ঠিক আছে, কিন্তু পরবর্তী অংশে ছন্দের শৈথিল্য দেখা যাচ্ছে। যথা—

এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিতি লাহু রে পাস॥[১২]

এখানে ছন্দ আদৌ রক্ষিত হয়নি' (রাজ্যেশ্বর ১৩৬৬: ৭-৮)। এক্ষেত্রে চর্যার সব পদকে গবেষক পূর্ণাজাতীয় বলে মনে করেননি।

২.৩ চর্যাপদের সাংগীতিক পরিবেশনে ব্যবহৃত সমধ্রুবা ও বিষমধ্রুবা সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। শার্ঙ্গদেবের *সংগীত-রত্নাকরের* ভাষ্য অনুসারে, সবগুলি পদ আবৃত্তি বা গীত হলে সেটি সমধ্রুবার পর্যায়ে পড়ে, অন্যদিকে শুধু ধ্রুব-পদ গীত হলে তা বিষমধ্রুবার মধ্যে পড়ে। টীকাকার সিংহভূপাল লিখেছেন, 'সর্বেষাং পাদানামাবৃত্তৌ সমধ্রুবা, ধ্রুবস্যৈবাবৃত্ত্যে বিষমধ্রুবেতি।' এই উক্তিতেও শার্ঙ্গদেবের *সংগীত-রত্নাকরের* সমর্থন মেলে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত চর্যা-সংগ্রহে দৃষ্ট হয় যে, প্রতিটি যুগল-পদের দ্বিতীয় পাদটি 'ধ্রু' বা 'ধ্রুব' নির্দেশিত। অর্থাৎ প্রতিটি পদের শেষ পাদটি ধুয়ার মতো সমস্বরে গাইবার নির্দেশ রয়েছে। যা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, যেহেতু প্রতিটি পদের ক্ষেত্রে একই ধরনের নির্দেশনা রয়েছে সেহেতু চর্যার পদগুলিকে সমধ্রুবার পর্যায়ভুক্ত বলা সংগত। অন্যদিকে চর্যার ২৮ ও ৪৩ সংখ্যক পদের ব্যাখ্যায় মুনিদত্ত লিখেছেন, 'পদস্যোত্তরপদেন ধ্রুবপদং বোদ্ধবাং' (নীলরতন ২০০১: ৭৬ ও ১১৩)।[১৩] টীকাকার সিংহভূপাল চর্যার এই দুটি গানেই প্রথম দুটি

পঙ্‌ক্তিকে একটি পদ হিসেবে গণ্য করেছেন। সাধারণত দুটি পঙ্‌ক্তি মিলে একটি পদ হয়, এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটিকে উত্তরপদ বলা হয় এবং সেটিকে ধ্রুব হিসেবে গীত হয়। অর্থাৎ প্রতিটি পাদযুগলের দ্বিতীয় পাদটি ধ্রুব। মূলত সেটিকেই উচ্চারণ সহযোগে গাওয়া কর্তব্য। এই ব্যাখ্যা অনুসারেও চর্যার পদগুলিকে সমধ্রুবার অন্তর্গত বলতে কোনো বাধা থাকে না। (রাজ্যেশ্বর ১৩৬৬: ৮)

অন্যদিকে 'সংগীত-রত্মাকরে'র অপর টীকাকার কল্লিনাথ সমধ্রুবা ও বিষমধ্রুবার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা একটু অন্য রকম। যেহেতু তিনি সমধ্রুবা ও বিষমধ্রুবার বিচারে গীতের কলির হিসাব বিবেচনায় নিয়েছেন, সেহেতু তাঁর ব্যাখ্যা-সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে তৎকালীন সংগীতের কলি বা ধাতু-বিভাগের পরিচয় প্রদান করা যায়।

সংগীত-শাস্ত্রকারদের মতে, সে কালে গানের চারটি অংশ ছিল, যথা: উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব এবং আভোগ। এর মধ্যে উদ্‌গ্রাহ হলো গীতের প্রারম্ভিক অংশ, মেলাপক অংশটি উদ্‌গ্রাহ ও ধ্রুবের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। অন্যদিকে ধ্রুব হলো গীতের প্রধান অংশ। আভোগ দিয়েই গীতের সমাপ্তি হতো। এই চারটি অংশকে তৎকালে ধাতু বলা হতো। উল্লেখ্য, সব গানে এই চারটি ধাতু থাকত না। তবে ধ্রুব অংশটি ছিল অনিবার্য; সবসময় এটিকে যথাযথভাবে রক্ষা করা হতো।

টীকাকার কল্লিনাথের বর্ণনামতে, চর্যার গানে প্রধানত দুটি ধাতুর অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেছেন, তা হলো—উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব। এ ছাড়া, তিনি পৃথক পদে আভোগ রচনার সুযোগ আছে বলেও অভিমত প্রকাশ করেছেন। রাজ্যেশ্বর মিত্রের মতে,

> কল্লিনাথের ব্যাখ্যা অনুসারে সমধ্রুবা বা বিষমধ্রুবা অর্থে ধ্রুব—এই অংশটি গীতের অপর কোনো অংশের সমান বা অসমান—এই রকম ধারণা হয়। ... অর্থাৎ সমধ্রুবা জাতীয় চর্যায় উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব একই রকম—কেবল গীতের কাঠামো বজায় রাখবার জন্যই একটি ধাতুবিভাগ পরিকল্পিত হয় মাত্র। অপর পক্ষে বিষমধ্রুবার ক্ষেত্রে ধ্রুব অংশটি উদ্‌গ্রাহ অপেক্ষা অধিক বা ন্যূন—এই রকম দৃষ্টিগোচর হয়। (রাজ্যেশ্বর ১৩৬৬: ৮)

কিন্তু এ কথাও ঠিক, যে সব চর্যার পদের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটেছে, সেগুলির কোনোটিই উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব অনুসারে বিন্যস্ত নয়। গবেষকদের অনুমান, হয়তো কল্লিনাথের যুগে চর্যাপদের প্রাচীন পরিবেশনশৈলী দেশীয় সংগীতের ঐতিহ্যগত পদ্ধতির মধ্যে মিশে যায়। একপর্যায়ে চর্যার প্রাচীনতম সাংগীতিক পরিবেশনার বিশেষত্বটি বিলুপ্ত হয়ে যায়, অথবা বহু ধরনের দেশীয় সংগীতের মধ্যে এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে আজ তাকে চিনে নেওয়া কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩ বাংলাদেশের ভাবসাধকদের চর্যাপদের গানের পুনর্জাগরণ

প্রাচীন বৃহত্তর বঙ্গভূমি চর্যাপদের অন্যতম উৎসভূমি। এই ভূমির ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ভাষিক, সাধনার পরিচয় চর্যাপদে এমনভাবে গ্রন্থিত হয়েছে বাংলাদেশের মানুষ একে আত্মপরিচয়ের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। মূলত এই দর্শনবোধ থেকে তাড়িত হয়েই বাংলাদেশের বাউল-ফকির ভাবসাধকেরা সম্প্রতি চর্যাপদের গানের পুনর্জাগরণ করেছেন।

৩.১ চর্যাপদের সংগ্রহকর্তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় চর্যাপদের গানগুলিকে কীর্তন বলেছেন। অনেকেই আবার চর্যাপদ থেকে কীর্তন বা বাউল গান এসেছে বলে উল্লেখ করে থাকেন। এ বিষয়ে সংগীতের ইতিহাসকার রাজ্যেশ্বর মিত্র বলেছেন, কীর্তন ও বাউল গানের পাশাপাশি বহু ধরনের সংগীত ধারা চর্যাপদের বহু আগেই প্রচলিত ছিল। (১৯৫৩: ৫০-৫১)

আমাদেরও ধারণা তাই। তা না হলে, চর্যাপদের গানের ভেতর 'বাউল' শব্দটির আদি উৎস এবং বাউল সাধনা-পদ্ধতির মূল বিষয়গুলো ধৃত হতো না। উল্লেখ্য, প্রাসঙ্গিকভাবে বেশ কয়েকজন গবেষক-তাত্ত্বিকগণ চর্যাপদের ভেতর বাউল-সাধনার প্রাচীনসূত্র আবিষ্কার করেছেন।[১৪] এক্ষেত্রে সাধারণত চর্যাপদের কবি বীণাপা রচিত ১৭ সংখ্যক পদে উল্লিখিত 'বাজিল' এবং ভাদেপা রচিত ৩৫ সংখ্যক পদে বর্ণিত 'বাজুল' শব্দ দুটিকে বিবেচনায় নেওয়া হয়ে থাকে।

বীণাপা রচিত চর্যাপদের ১৭ সংখ্যক পদে পাওয়া যায়: 'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী/ বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই'। এ ছাড়া, ভাদেপা রচিত ৩৫ সংখ্যক পদে আছে, 'বাজুলে দিল মো লক্খ ভণিআ/ মই অহারিল গঅণত পসিআ'। আহমদ শরীফ *বাউলতত্ত্ব* গ্রন্থে স্বীকার করেছেন, চর্যাপদের এই 'বাজিল > বাজুল' থেকেই 'বাউল' শব্দের যেমন উৎপত্তি, তেমনি সাধনারও বিস্তার ঘটেছে চর্যাপদের কাল থেকে (আহমদ ২০১৩: ৪৬)। এক্ষেত্রে বাউল সাধনা, বাউল সংস্কৃতি, এমনকি বাউল গানের প্রাচীনতম সাহিত্যিকসূত্র যে প্রাচীন বাংলার চর্যাপদে গ্রন্থিত রয়েছে, সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এ ধরনের পর্যবেক্ষণ বাংলাদেশের ভাবসাধকদের চর্যাপদের পুনর্জাগরণের ইতিহাস ও চর্চায় এক ধরনের প্রেরণা সঞ্চার করে।

৩.২ চর্যাপদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংকলিত *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* (১৯১৬) গ্রন্থে চর্যাপদের বিভিন্ন পদের শীর্ষে বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর উল্লেখ রয়েছে। এতে অনেকের মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে, পদগুলো হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উল্লেখিত রাগেই পরিবেশন করা বিধেয়। কিন্তু আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের সংগীত-শাস্ত্রকার শার্ঙ্গদেরের *সংগীত-রত্নাকর*, হরিপালের *সংগীত-সুধাকর* এবং *সংগীত-রত্নাকরের* টীকাকার সিংহভূপাল, কল্লিনাথ প্রমুখ প্রদত্ত 'চর্যার সংজ্ঞা'র কোথাও কোনো রাগের উল্লেখ পাইনি। এ প্রসঙ্গে রাজ্যেশ্বর মিত্রের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য; তিনি লিখেছেন—

> চর্যার সংজ্ঞায় রাগের কোনো নির্দেশ নেই বলে এই গীতে রাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল— এমন নয়। রাগের ব্যবহার সম্বন্ধে কোনো বিশেষ বিধি নেই বলে রাগ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয় নি। (রাজ্যেশ্বর ১৩৬৬: ৬)

প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেছেন সাইম রানা; তিনি লিখেছেন—

> যেহেতু কারো কারো মতে চর্যা মার্গসংগীত নয়, ফলে সুনির্দিষ্ট সুরে গাইবার বাধ্যবাধকতা থাকবার সম্ভাবনা না থাকাই স্বাভাবিক। ... ফলে বৈদিক ও মার্গ অভিজাত সংগীতের ন্যায় সুনির্দিষ্ট রাগের কাঠামোয় চর্যাগান গাওয়া হতো, তা বলা অত্যুক্তি হবে। (সাইম ২০১৭)

এক্ষেত্রে চর্যার পদ-শীর্ষে নির্দেশিত রাগ-রাগিণীর অনুসরণেই কেবল চর্যা-পরিবেশন করতে হবে, এমন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বির্তক হতে পারে। এ ছাড়া, চর্যার যে পদগুলি পরিবেশনের ক্ষেত্রে কোন রীতি অনুসৃত হবে তাও অদ্যাবধি অমীমাংসিত।

এ পরিপ্রেক্ষিতে উপর্যুক্ত সংগীত-ঐতিহ্যের ইতিহাসের আলোকে নতুন পর্যবেক্ষণ ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে দুটি পর্যবেক্ষণ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি; প্রথমত নেপাল থেকে ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেছিলেন, এবং দ্বিতীয়ত নেপালে চর্যা-সংস্কৃতির ঐতিহ্য 'চচা' বা 'চাচা' গান, চর্যানৃত্য প্রভৃতি নামে চর্চিত হয়ে আসছে, এমনকি চর্যাপদের বহু পাণ্ডুলিপি লিপিবদ্ধ, ব্যবহার ও চর্যাপদের নানা ধরনের প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। অতএব নেপালের বিভিন্ন স্থানে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষিত, ব্যবহৃত চর্যাপদের পাণ্ডুলিপি এবং চর্যাপদের উপস্থাপনরীতি প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হাওয়া সম্ভব।

৩.৩ চর্যাপদের বিভিন্ন পরিবেশন-শিল্প প্রত্যক্ষণের লক্ষ্যে ২০০৯, ২০১৭ এবং ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে তিন বার নেপালের কাঠমান্ডু, ললিতপুর, ভক্তপুর প্রভৃতি স্থানে আমরা ক্ষেত্র-অনুসন্ধান ও গবেষণা সম্পন্ন করি। গবেষক হিসেবে প্রতিবার সেখানে চর্যাপদের গানের ঐতিহ্যগত গায়ক ও নৃত্যশিল্পীদের পরিবেশন প্রত্যক্ষণের পাশাপাশি নেওয়ারি ভাষার চর্যা/চচা-গবেষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। শুধু তাই নয়, বজ্রযানী কৃত্যাচারের সাথে সংশ্লিষ্ট চর্যা/চচা সংগীতগুরু নরেন্দ্রমুনি বজ্রাচার্যের সান্নিধ্যে চর্যা/চচা সংগীত ঐতিহ্যের সুর, তালসহ পরিবেশনরীতির রূপ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটে। এ ছাড়া, বজ্রযানী কৃত্যাচারে ব্যবহৃত চর্যাপদের (নেওয়ারি ও দেবনাগরী লিপিতে লিপিকৃত) কয়েকটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির স্ক্যান কপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ করা যায়, নেপালে প্রচলিত চর্যা/চচা বা চাচা গানের পাঠক, গায়ক বা পরিবেশনকারীরা সাধারণত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যাপদের আদি পাণ্ডুলিপি নির্দেশিত রাগের অনুসরণ করেন না। এমনকি নেপালের ব্যবহৃত বিভিন্ন চর্যাপদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে একই পদের শীর্ষে ভিন্ন ভিন্ন রাগ-রাগিনীর নির্দেশনা রয়েছে। যেমন, নেপালের কাঠমান্ডুতে অবস্থানরত চর্যাপদের গানের ঐতিহ্য অনুসারী গায়ক ও গুরু নরেন্দ্রমুণি বজ্রাচার্যের কাছে দেবনাগরি ও নেওয়ারি লিপিতে লিপিবদ্ধ বেশ কয়েকটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে, যা তিনি তাঁর গুরু অষ্টরত্ন বজ্রাচার্য ও কর্ণহর্স বজ্রাচার্যের নিকট থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।[১৫]

নরেন্দ্রমুণি বজ্রাচার্যের কাছে সংরক্ষিত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে অন্তত দুটি পাণ্ডুলিপিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহার* ৪ সংখ্যক চর্যাপদটি 'ত্রিহন্ডা' শিরোনামে লভ্য। এই পদটির রচয়িতা গুণ্ডরীপা। শাস্ত্রীর সম্পাদিত পাঠে পদ-শীর্ষে 'অরু' রাগের নির্দেশনা থাকলেও নরেন্দ্রমুণি বজ্রাচার্যের সংগৃহীত হস্তলিখিত দুটি পাণ্ডুলিপিতে একই পদটি 'কর্নাটি' রাগে পরিবেশনের নির্দেশনা রয়েছে। অন্যদিকে নেপালের কাঠমান্ডু থেকে প্রকাশিত রত্নকাজী বজ্রাচার্য সংকলিত ও সম্পাদিত *চচা-মুনা* গ্রন্থে যথাক্রমে 'কর্নাটি' ও 'পদ্মাঞ্জলী' রাগ এবং 'ঝপ' ও 'মাথ' তালের উল্লেখ রয়েছে (রত্নকাজী ১৯৯৯: ৯ ও ১১৮)।

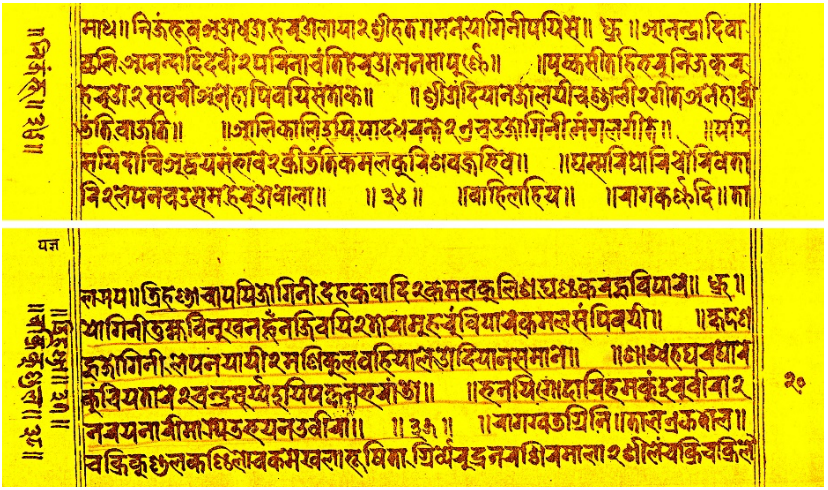

চিত্র ১: নেপালের চর্যাগুরু নরেন্দ্রমুণি বজ্রাচার্যের নিকট সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে ৪ সংখ্যক চর্যাপদ।

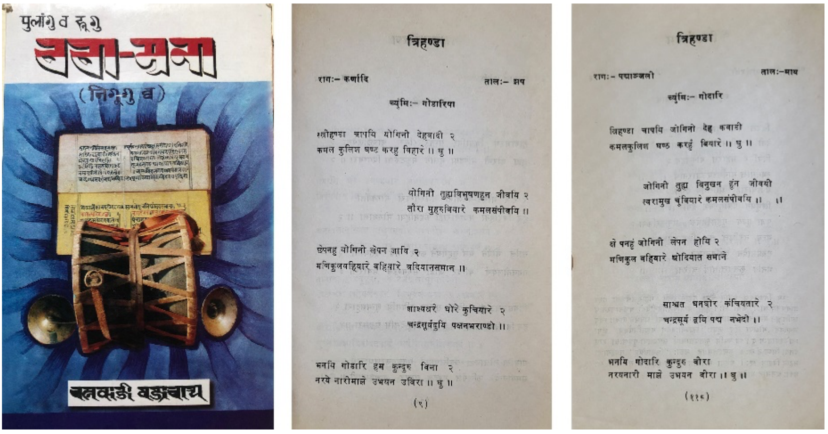

त्रिहण्डा

राग:– कर्णादि तालः– झप

ध्रुमि:– गोडारिया

त्रीहण्डा चापयि योगिनी देहवाढी २
कमल कुलिश घण्ट करहु विहारे ॥ घु ॥

योगिनी तुह्मविभुषणहुन जीवयि २
तौरा मुहरुवियारे कमलसंपीवयि ॥

छेपनहु योगिनी लेपन जायि २
मणिकुलवहियारे बहियारे ओदियानसमान ॥

शाश्वधरे घोरे कुचियारे २
चन्द्रसूर्यदुयि पक्षनभराण्डो ॥

भनयि गोडारि हम कुन्दुरु विना २
नरये नारीमाझे उभयन उविरा ॥ घु ॥

(९)

त्रिहण्डा

राग:– पद्माञ्जली तालः–माथ

ध्रुमि:– गोदारि

त्रिहण्डा चापयि जोगिनी देह कवाडी
कमलकुलिश घण्ठ करहुं बियारे ॥ घु ॥

जोगिनी तुह्म बिनुखन हुंन जीवयी
स्वरामुख चुंबियारे कमलसंपीवयि ॥ ॥

क्षे पनहुं जोगिनी लेपन होयि २
मणिकुल वहियारे ओदियात समाने

साश्वत घनघोर कंचियतारे २
चन्द्रसूर्य दुयि पथ नभेदी ॥

भनयि गोदारि कुन्दुरु वीरा
नरयनारी माझे उभयन वीरा ॥ घु ॥

(११८)

চিত্র ২: নেপাল থেকে প্রকাশিত *চচা-মুনা* গ্রন্থে মুদ্রিত ৪ সংখ্যক চর্যাপদের দুটি পাঠ।

এ ছাড়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত শশিভূষণ দাশগুপ্ত সংগৃহীত ও সংকলিত *নব চর্যাপদ* গ্রন্থে একই পদের শীর্ষে 'কর্ণাটি' রাগ ও 'ঝপ' তালের উল্লেখ রয়েছে (শশিভূষণ ১৯৮৯: ৩)। বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সংকলিত 'নতুন চর্যাপদ' গ্রন্থে পদটিতে 'পদ্মাঞ্জলী' রাগ ও 'মাথ' তালের নির্দেশনা রয়েছে (সৈয়দ মোহাম্মদ ২০১৭)।

এভাবে একই চর্যাপদ একাধিক রাগে পরিবেশনের কথা বর্ণিত হয়েছে সাইম রানার একটি প্রবন্ধে। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি চর্যার পরিবেশন-শিল্পের সূত্র অন্বেষণ-কালে

(২০০৯) চর্যানৃত্যশিল্পী রাজেন্দ্র শ্রেষ্ঠের সাক্ষাৎ লাভ করেন। মূলত তাঁর নিকট থেকে প্রাপ্ত চর্যার ৪র্থ সংখ্যক সুর সম্পর্কে সাইম রানা উল্লেখ করেছেন যে,

> এই সুরের চলন শুনে আধুনিক মনে হয় না। কিছুটা প্রাচীন মেয়েলি গীত বা সাধারণ লোকগীতের মতো শোনায়। তিনি [রাজেন্দ্র শ্রেষ্ঠ] বলেন, এই চর্যাটি [৪র্থ সংখ্যক চর্যাপদ] রাগ ত্রাবলী এবং তাল ত্রিহুরায় প্রতিষ্ঠিত। আবার তিনি বলেছেন, কখনো কখনো কামোদ রাগ রূপের আশ্রয়েও এই গীতটি পরিবেশন করে থাকেন। (২০১৭: ৫৬-৫৭)

উপর্যুক্ত ভাষ্য থেকে প্রমাণিত হয়, নেপালে প্রচলিত চর্চাগানের ঐতিহ্যিক রীতিতে গীত চর্যাপদের গানের অনেক ক্ষেত্রে রাগের অনুসরণের পরিবর্তে বিশেষ এক প্রকারের সুরের সঞ্চার প্রত্যক্ষ করা যায়। আর সেই সুর লোকায়ত সুরের সঙ্গে অধিক সংগতিপূর্ণ। তা ছাড়া 'চর্যার গীত রূপের প্রবাহ বাউল-ফকির গানে এসে মিশেছে এমন দাবি অনেকেই করেছেন' (বিশ্বনাথ ২০১৬: ১৫)। এমনকি শান্তিদেব ঘোষ বলেছেন, 'আমার তো মনে হয় এর [চর্যাপদের] একটা বহতা ধারা ছিল যা বাউল গান পর্যন্ত এসে মিশেছে।' (শঙ্খ ২০১৩: ৬৯-৭০)

উপর্যুক্ত পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রাচীন বাংলার চর্যাপদ এবং নেপালে প্রচলিত সাম্প্রতিক কালের চচা বা চাচা গানের ঐতিহ্য, ঐতিহ্যগত পাণ্ডুলিপি ও প্রকাশিত গ্রন্থের পাঠ-পর্যালোচনার ভিত্তিতে বিভিন্ন উপায়ে চর্যাপদ পরিবেশনের যৌক্তিক ভিত্তি লাভ করা যায়। মূলত সেইসূত্র ধরেই সাম্প্রতিক কালের বাংলাদেশের ভাবসাধকদের চর্যাপদের গানের পুনর্জাগরণেরও যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.৪ এ পর্যায়ে বাংলাদেশের ভাবসাধকদের চর্যাপদের গানের পুনর্জাগরণের পূর্বাপর ইতিহাস ও চর্চার কয়েকটি দিক উল্লেখ করা যেতে পারে। চর্যাপদের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার ও প্রকাশনার শতবর্ষপূর্তির বেশ আগে অর্থাৎ ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের ভাবসাধকদের মধ্যে চর্যাপদের পুনর্জাগরণের কার্যক্রম শুরু হয়। তবে, এই উদ্যোগ হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি, বরং এরও একটি দীর্ঘ ও বহুমাত্রিক পূর্বপ্রেক্ষাপট রয়েছে। প্রেক্ষাপট হিসেবে প্রথম পর্যায়ে চর্যাপদভিত্তিক বিচিত্র গবেষণার পাশাপাশি সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনার উদ্যোগ চোখে পড়ে। যেমন—চর্যাপদের সময়, চর্যাপদের কিছু কবি ও চরিত্রকে নিয়ে যথাক্রমে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর *বেনের মেয়ে* ও ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে সেলিনা হোসেনের *নীল ময়ূরের যৌবন* উপন্যাস দুটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। যদিও এই দুটি উপন্যাস প্রকাশের মধ্যবর্তীকালে অতীন্দ্র মজুমদার ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে *চর্যাপদ* গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করেছিলেন, '*চর্যাপদ* গল্প-উপন্যাস-রম্যরচনার বই নয়' (অতীন্দ্র ১৯৭৩: ৯)। তবু চর্যাপদ অবলম্বনে সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনার থেমে থাকেনি। এমনকি সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়াতে বেশ কয়েকজন কবি চর্যাপদের আধুনিক কাব্যিক অনুবাদ করেছেন। যেমন চর্যার পদগুলো ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে সুভাষ মুখোপাধ্যায় আধুনিক কাব্য-অনুবাদে *চর্যাপদ* নামে, এবং ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ আধুনিক বাংলা অনুবাদে *অন্তউড়ি* নামে প্রকাশ করেন। এই প্রেক্ষাপটের মধ্যে বর্তমান প্রবন্ধকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে চর্যাপদের গানের পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার চর্যাপদগুলো সমকালীন বাংলাভাষায় গীত-রূপান্তর সম্পন্ন করতে সক্ষম হন, যা ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে *অবণাগবণ: সমকালীন বাংলায় প্রাচীন চর্যাপদের রূপান্তরিত গীতবাণী* নামে

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (সাইমন ২০১০)। এ ছাড়া, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে 'সহজিয়া' নামের একটি ছোটোকাগজে চর্যাপদের আখ্যান অবলম্বনে প্রবন্ধকার রচিত *ন নৈরামণি* নাটক প্রকাশিত হয়। নাটকটি পরবর্তীকালে *বোধিদ্রুম: একটি বুদ্ধ নাটক* নামে পুনর্লিখিত ও গ্রন্থাকারে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় (সাইমন ২০১৪)। এর বাইরেও চর্যাপদকেন্দ্রিক সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় (বিশ্বনাথ ২০০৯)।

দ্বিতীয় পর্যায়ে চর্যাপদের সুর-সংযোজন ও নাট্যরূপ উপস্থাপনের বিষয় দৃষ্ট হয়। চর্যাপদের গানের সুর-সংযোজন ও স্বরলিপি প্রণয়নের বিষয়টি প্রথম দৃষ্টি গোচর হয় ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে উৎপলা গোস্বামীর *বাংলা গানের বিবর্তন* গ্রন্থে (উৎপলা ১৩৬৭: ২-৩)। এই গ্রন্থে তিনি নিজের সুরারোপিত চর্যাপদের প্রথম পদ লুইপা বিরচিত 'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল'-এর স্বরলিপি মুদ্রণ করেন।[১৬] আমাদের জানামতে, এরপর ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে খুলনার স্কুল অব মিউজিক থেকে প্রকাশিত *ফসলের* প্রথম খণ্ডে সংগীতাচার্য সাধন সরকারকৃত দুটি চর্যাপদের স্বরলিপি মুদ্রিত হয়েছিল (সাধন ১৯৭৩: ১)। যে দুটি পদের স্বরলিপি মুদ্রিত হয়েছিল, সেগুলো হলো: ভুসুকুপাদানাম বিরচিত ৪৯ সংখ্যক চর্যাপদ 'বাজ-নাব পাড়ী পউআঁ খালেঁ বাহিউ' এবং ডোম্বিপাদানাম বিরচিত ১৪ সংখ্যক চর্যাপদ 'গঙ্গা জউনা মাঝেরে বহই নাঈ'। স্কুল অব মিউজিকের পক্ষ থেকে *ফসলের* প্রথম খণ্ডের সম্পাদকীয় ভাষ্যে চর্যাপদ পুনর্জাগরণের কথাও ভিন্নভাবে উল্লিখিত হয়েছে, ভাষ্যটি এমন—

> বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারী সাংগীতিক নিদর্শনগুলির উদ্ধার ও সংরক্ষণের মাধ্যমে এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে [স্কুল অব মিউজিক] তার সংগ্রামী ভূমিকা পালনে সর্বদা সচেষ্ট।
>
> এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে স্কুল অব মিউজিক বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাগীতির সুরারোপ থেকে আরম্ভ করে বাংলার প্রাচীন লোক সংগীতের বিভিন্ন পর্যায়ে তার অনুসন্ধান ও গবেষণাকে বিস্তৃত করেছে। ...
>
> ... তাই স্কুল অব মিউজিক চর্যাগীতির আবেদনকে ব্যাপকভিত্তিক করবার প্রচেষ্টায় এযাবৎ সংগৃহীত সবকটি চর্যাগীতির সুরারোপ করেছে—ভারতীয় রাগসংগীত, বাংলার লৌকিক সুর ও চর্যার ভাবমণ্ডলের সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে। (সাধন ১৯৭৩: ছয়-সাত)

এই বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে খুলনার মতো একটি প্রান্তিক জেলা শহর থেকে স্কুল অব মিউজিকের উদ্যোগে ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিসরে চর্যার সাংগীতিক পুনর্জাগরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। লক্ষ্যণীয় বিষয়, এই উদ্যোগে চর্যাপদের সুর-সংযোজনে রাগসংগীতের পাশাপাশি লৌকিক সুরকেও সমমাত্রায় গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল। যদিও সেই সুরারোপিত চর্যাপদের কোনো রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে না বলে সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ নেই।

দীর্ঘ বিরতির পর চর্যাপদের উপস্থাপনের অনন্য নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা যায় নরেন বিশ্বাসের পরিচালনায় 'ঐতিহ্যের অঙ্গীকার' প্রকল্পের অধীনে আবৃত্তি সংগঠন 'শব্দরূপে'র পরিবেশনায় অন্তত দুটি ক্যাসেটের প্রকাশনায়। ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে *ঐতিহ্যের অঙ্গীকার-১* নামে 'চর্যাপদ থেকে মেঘনাদবধ কাব্য পর্যন্ত হাজার বছরের বাংলাকাব্যের অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তিমালা'র 'শব্দরূপে'র পরিবেশনায় আবৃত্তি ক্যাসেটে প্রকাশিত হয়, এতে চর্যাপদের বেশ কয়েকটি পদের শব্দরূপ

আবৃত্তি আকারে উপস্থাপিত হয় (নরেন ১৯৯০)। এরপর ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে শব্দরূপের পরিবেশনায় *ঐতিহ্যের অঙ্গীকার-৫* শিরোনামে 'চর্যাগীতি থেকে লালনগীতি পর্যন্ত হাজার বছরের বাংলা গানের ক্যাসেট' প্রকাশিত হয়, এতে সাদী মোহাম্মদের সুরে ও কণ্ঠে চর্যাপদের ২৮ সংখ্যক পদের সংগীতরূপ সংকলিত হয় (সাদী ১৯৯৩)।

পরবর্তীকালে ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মৎকৃত সমকালীন ভাষায় প্রাচীন বাংলার চর্যাপদের রূপান্তরিত গীতবাণীতে প্রথম পর্যায়ের সুর-সংযোজন করেছিলেন কফিল আহমেদ। এরপর ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে স্বরবৃত্ত আবৃত্তি সংগঠনের আবৃত্তি-প্রযোজনায় চর্যাপদ অবলম্বনে রচিত *ন নৈরামণি* নাটকে ব্যবহৃত চর্যাপদের কিছু রূপান্তরিত গীতবাণীতে সুর-সংযোজন করেন রবিশঙ্কর মৈত্রী। ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা থিয়েটারের মঞ্চনাটক-প্রযোজনায় *ন নৈরামণি*র অন্তর্ভুক্ত চর্যাপদের কিছু রূপান্তরিত গীতবাণীতে সুর-সংযোজন করেন শিমূল ইউসুফ ও কমল খালিদ। এর বাইরে মৎ প্রণীত *বোধিদ্রুম* নৃত্যনাট্যের জন্য নেপালে প্রচলিত চর্যাগানের ঐতিহ্যিক অনুপ্রেরণায় সাইম রানা ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে বেশ কিছু চর্যাপদের সুর-সংযোজন করেন, যদিও নৃত্যনাট্যটি শেষ পর্যন্ত মঞ্চরূপ লাভ করেনি। ফলে তাঁর কৃত চর্যার সেই গানগুলোও প্রকাশ্যে না এলেও *সাহিত্য পত্রিকায়* মুদ্রিত ৩টি চর্যাপদের আংশিক স্বরলিপি লভ্য (সাইম ২০১৭: ৫৪, ৫৭-৫৮)। এর বাইরে বাংলাদেশ ও ভারতে বিভিন্ন পর্যায়ে চর্যাপদের গানের সুর-সংযোজন পরিবেশন করেছেন বলে তথ্য পাওয়া যায়।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটগুলো বাংলাদেশের ভাবসাধকদের চর্যাপদের গানের পুনর্জাগরণের কার্যক্রমের ভিত্তি হিসেবে তৈরি করেছিল বৈকি।

৩.৫ বাংলাদেশের ভাবসাধকদের চর্যাপদের গানের পুনর্জাগরণের ইতিহাস অন্বেষণে জানা যায়, ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে দেশব্যাপী বাউল-ফকির সাধকশিল্পীদের মধ্যে প্রাচীন বাংলার চর্যাপদের পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে ভাবসাধকদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়েছিল। সেই সূত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম ঐতিহ্যিক সুরের কাঠামো অনুসরণে লুইপা রচিত চর্যাপদের প্রথম পদের আদিবাণীতে সুর-সংযোজিত হয়। 'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল' গানটির সুরে কাফি ঠাটের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রথম পদের শীর্ষে উল্লেখিত পটমঞ্জরী রাগও কাফি ঠাটেরই অন্তর্গত। ভাবসাধকদের কাছে গৃহীত 'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল'—এর কাফি ঠাটের অন্তর্গত সুরটি উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম সুর ভাওয়াইয়ার আবহ গ্রহণ করেও এমন একটি স্বতন্ত্র ভঙ্গি ধারণ করেছে, যা খুব সহজে সম্মেলক কণ্ঠে গাওয়া যায় এবং যাতে *সংগীত-রত্নাকরের* টীকাকার কল্লিনাথের বর্ণিত চর্যার সংজ্ঞাসূত্রের অনুসরণ অনেকটাই প্রতীয়মান হয়। বাংলাদেশের ভাবসাধকদের চর্যাপদের গানের পুনর্জাগরণের আসর অবলোকনপূর্বক করুণাময় গোস্বামী উল্লেখ করেছেন—

> চর্যাপদের বেসিক ছন্দ এটাই—চতুর্মাত্রিক ছন্দ, যেটা ভাবনগর সাধুসঙ্গের সাধকশিল্পীরা অনুসরণ করেছে। আমি লক্ষ করেছি, সাধকশিল্পীদের গায়কীতে একটি চর্যাপদ ১৬ মাত্রায় শেষ হয়েছে, কোথাও আঘাত পেড়ছে, কোথাও হয়তো প্রবাহিত হয়েছে, যেমন—একটি শব্দের পরে সাউন্ডটা বা স্বরধ্বনিটা থেকে যাচ্ছে, যা আবার গুণে গুণে ১৬-তে গিয়ে শেষ হচ্ছে। (করুণাময় ২০২০: ৩০৪)

আসলে, শার্ঙ্গদেব *সংগীত-রত্মাকরের* টীকাকার কল্লিনাথ চর্যার পরিবেশন-রীতির ব্যাখ্যায় যেমনটা লিখেছিলেন, 'ষোড়শমাত্রাঃ পাদে পাদে/ যত্র ভবন্তি নিরস্ত বিবাদে'; বাংলাদেশের ভাবসাধকদের চর্যাপদের পরিবেশনে তার প্রত্যক্ষরূপ দেখেই করুণাময় গোস্বামী এই মন্তব্য করেছিলেন। ভাবসাধকদের চর্যাপদের গানের পুনর্জাগরণের বেশ কয়েকটি গানে চতুর্মাত্রিক আদ্ধা তালেরও প্রয়োগও দৃষ্ট হয়, যা লোকায়ত সুর-সঞ্জাত হলেও শাস্ত্র-নির্দেশিত তালের বন্ধনের সাথেও কোথাও কোথাও সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ভাবসাধকদের চর্যাপদের গানের পুনর্জাগরণ আদি পদে লোকায়ত সুর-প্রয়োগের মাধ্যমে শুরু হলেও পরবর্তী পর্যায়ে চর্যাপদের গানকে সমকালের মানুষের বোধগম্য করে তোলার বিবেচনা গৃহীত হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাধকশিল্পীরা সমকালীন বাংলাভাষায় গীত-রূপান্তরিত চর্যাপদের গানগুলোতে সুর-সংযোজন ও পরিবেশনে উদ্বুদ্ধ হন। ইতোমধ্যে বাউল-ফকির সাধকশিল্পীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় চর্যাপদের ৫০টি পদেই সুর-সংযোজিত যেমন হয়েছে, তেমনি পদগুলো বিভিন্ন স্থানে পরিবেশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংকলনের বহির্ভূত বাকি সাড়ে ৩টি চর্যাপদের বাণী তিব্বতি অনুবাদের আশ্রয়ে সুকুমার সেনের পরিকল্পিত ও পুনর্গঠিত পাঠ থেকে গৃহীত হয়েছে।

বাংলাদেশের সাধকশিল্পীরা সুর-সংযোজন ও পরিবেশনের মাধ্যমে চর্যাপদের গানের সাংগীতিক পুনর্জাগরণের কয়েকটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যথা—

১. লোকায়ত সুরের মাধ্যমে প্রাচীন ভাষায় চর্যাপদ উপস্থাপন,

২. লোকায়ত সুরে সমকালীন বাংলাভাষায় প্রাচীন চর্যাপদের গীত-রূপান্তরিত গান পরিবেশন,

৩. লোকায়ত সুরে প্রাচীন বাংলাভাষার সমন্বয়ে সমকালীন বাংলায় রূপান্তরিত চর্যাপদের গান উপস্থাপন,

৪. চর্যাপদের রাগের অনুসরণে সমকালীন বাংলাভাষায় রূপান্তরিত চর্যাপদের গান পরিবেশন,

৫. প্রাচীন পাণ্ডুলিপির শীর্ষে নির্দেশিত রাগের অনুসরণে প্রাচীন বাংলাভাষায় চর্যাপদের গান উপস্থাপন,

৬. প্রাচীন ভাষার চর্যাপদের গান স্বাধীনভাবে বিভিন্ন রাগের মিশ্রণে উপস্থাপন।

সাধারণত উপর্যুক্ত ছয়টি পদ্ধতি অনুসরণে বাংলাদেশের ভাবসাধকদের মধ্যে চর্যাপদের পুনর্জাগরণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রায় সকল সাহিত্যিক নিদর্শনের সাংস্কৃতিকরূপ পরিবেশন শিল্পের আঙ্গিকে অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। সে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই* হোক, *মনসামঙ্গল* বা *রামায়ণ-মহাভারতই* হোক, এ সকল সাহিত্যিক নিদর্শনের নানা অংশ বা অংশবিশেষ বিচিত্রভাবে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশিত হয়ে আসছে। কেবল প্রাচীন বাংলার আদি

সাহিত্য-সংস্কৃতির নিদর্শন চর্যাপদের কোনো জীবন্ত পরিবেশনার রূপ বাংলা অঞ্চলে চলমান ছিল না। যদিও চর্যাপদে বর্ণিত ভাব ও দেহসাধনার ধারা বাংলার বাউল-ফকির ও অন্যান্য সাধকের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। সেই সূত্র ধরে বাংলার সর্বত্র ভাবসাধকদের মধ্যে চর্যাপদের গানের পুনর্জাগরণের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। আজ এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, চর্যাপদের পুনর্জাগরণের কার্যক্রম বাংলাদেশের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের ভাবসাধকদের মধ্যে সম্প্রসারিত হলে চর্যাপদে বর্ণিত 'অদ্বয় বঙ্গালে'র স্বরূপ কাঠামো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

টীকা

১. উদ্ধৃত অংশের সরল অনুবাদ থেকে জানা যায়: 'যথাসময়ে তিনি (জয়াপীড়) পৌণ্ড্রবর্ধনে প্রবেশ করিলেন; এই নগর গৌড় বাজ্যের অন্তর্গত। এই সময়ে নৃপতি জয়ন্ত ইহার রক্ষাকর্তা ছিলেন। তিনি পৌরসমৃদ্ধি দেখিয়া প্রীত হইলেন ও নৃত্যদর্শন করিবার জন্য কার্তিকেয় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ নরপতি ভরতমুনির মতানুযায়ী নৃত্যগীতাদি দেখিয়া মন্দিরের দরজার পাশে শিলাতলে বসিলেন। তাঁহার বিশেষ প্রভাবে চকিত হইয়া জনগণ তাঁহার পার্শ্ব পরিত্যাগ করিলে কমলা নামে এক নর্তকী সেই সুন্দর পুরুষকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করিল যে, এই ছদ্মবেশী পুরুষ নিশ্চয়ই উচ্চবংশজাত রাজা অথবা রাজপুত্র হইবেন। ... রমণী নানাবিধ মধুর আলাপে মনে অনুগ্রহের সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে নৃত্য শেষে সখীর গৃহে লইয়া গেল।' (কহলন ১৩৬৭: ৭১-৭২)

২. রাধাগোবিন্দ বসাকের অনুবাদটি আরেকটু বিস্তৃত, অনুবাদটি হলো: (রামপাল রামাবতী নগরীর মেরুসদৃশ করিয়া। নির্মাণ করিয়াছিলেন)—যে রামাবতী নগরী অমরাবতী-তুল্য হইয়াছিল এবং যাহাতে বরেন্দ্রীর বৈশিষ্ট্যযুক্ত মুরজধ্বনি কৃত বা শ্রুত হইত, যাহা নিরস্তবিপ্লবা হইয়াছিল এবং যাহা সত্য-পরিপূর্ণ বুধজনদ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল (অথবা, যাহা প্রতিবন্ধরহিত অযাচিত দান-প্রাপ্তিতে পরিতৃপ্ত বুধজনদ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল)। (রাধাগোবিন্দ ১৯৫৩: ৯৩)

৩. উদ্ধৃতি ব্যতীত টীকাটির নিম্নবর্ণিত অর্থ লভ্য জ্যোতি বিশ্বাস প্রণীত *সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত: ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিশ্লেষণ* শীর্ষক গ্রন্থে, যথা: '(রামপাল রামপাল রামাবতী নগরীকে মেরুসদৃশ্য করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন)—যে রামাবতী নগরী অমরাবতী তুল্য হইয়াছিল এবং যাহাতে বরেন্দ্রীর বৈশিষ্ট্যযুক্ত মুরজধ্বনি কৃত্য বা শ্রুত হইত, যাহা নিরস্তবিপ্লবা হইয়াছিল এবং যাহা সত্য পরিপূর্ণ বুধজন দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল (অথবা, যাহা প্রতিবন্ধরহিত অযাচিত দান-প্রাপ্তিতে পরিতৃপ্ত বুধজন দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল)। (জ্যোতি ২০০৮: ১৪৮)

৪. মোহা. মোশাররফ হোসেনের বর্ণনা অনুসারে জানা যায়, প্রত্নতাত্ত্বিক খননে নওগাঁ জেলায় অবস্থিত সোমপুর মহাবিহারের ১২ কিমি উত্তরপশ্চিমে ধামুরহাট উপজেলার জগদ্দল মৌজায় অবস্থিত বটকৃষ্ণ রাজার বাড়ি নামক সাংস্কৃতিক ঢিবি উদঘাটিত হয়েছে (২০১২: ৫৪)। তিনি আরো জানিয়েছে যে, 'বস্তুত বটকৃষ্ণ রাজার বাড়ি থেকে ৮ কিমি দূরে প্রচুর দিঘি, সাংস্কৃতিক ঢিবি ও পুরাবস্তুর জঞ্জাল অধ্যুষিত আমাইর নামে একটি ইউনিয়ন আছে। তাই এটা সম্ভব যে, বর্তমান "আমাইর" নামটি আদিঐতিহাসিক যুগের "রামাবতী" নামের কথ্য রূপ।' (২০১২: ৫৮)

অন্যদিকে বরেন্দ্র অঞ্চলে রামপাল প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে ভিন্নমতও প্রচলিত রয়েছে, তা হলো: 'বরেন্দ্রভূমি বহুদিন যাবৎ কৈবর্তশাসনে থাকার পর রামপাল পুনরায় বরেন্দ্রে পাল শাসন প্রতিষ্ঠিত করে রাজ্যে কৃষির উন্নতি, প্রজাদের করভার লাঘব, পুনর্বাসনমূলক নানা প্রকার কাজের মাধ্যমে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

রামাবতী নামক স্থানে রামপাল তাঁর নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। রাজধানী রামাবতী মালদহের নিকটবর্তী ছিল বলে মনে হয়।' (জ্যোতি ২০০৮: ১২২)

৫. শশিভূষণ দাশগুপ্ত উল্লেখ করেছেন, 'পালরাত্বের পূর্বে বাঙলায় বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতি সঠিকভাবে জানা যায় না—তবে অনুমিত হয় যে, মহাযান সম্প্রদায়ের উদার মতবাদই সাধারণ্যে আদৃত হত। এই সময়েই মহাযান মত বজ্রযানে রূপান্তরিত হয়।" (১৯৯৬: ২০) তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, 'খ্রীষ্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে মহাযান বৌদ্ধধর্মের পরিণতিকেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বলা হয়। ... মহাযানীদের লক্ষ্য করুণা ও শূন্যতার অবলম্বনে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় কয়েকটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য বুদ্ধত্বলাভ। মহাযান-মতে, প্রত্যেকের সম্যক বুদ্ধত্ব লাভ করবার শক্তি আছে—যেহেতু প্রত্যেকের মধ্যে বুদ্ধ রয়েছেন। এটি পূর্ণ প্রজ্ঞা ও সর্বভূতে মহাকরুণার দ্বারাই সম্ভব; এই মহাকরুণা তাকে বিশ্বের কল্যাণ-কামনায় উদ্বুদ্ধ করে। বিশ্বের কল্যাণ তাঁদের কাছে ব্যক্তিগত নির্বাণের চেয়ে শ্রেয়। ... কালক্রমে মহাযান-সম্প্রদায়ের মধ্যেই দুটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়—পারমিতানয় ও মন্ত্রনয়। মন্ত্রনয় বা মন্ত্রযান সম্ভবত তান্ত্রিক-বৌদ্ধধর্মের বা বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান-প্রভৃতি ধর্মমতের পূর্বরূপ।' (১৯৯৬: ২০)

৬. এই চাঁচর সংগীতরীতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা লভ্য কিরীটি মাহাত ও মিরিয়া মালিক প্রণীত *আদি চর্যাপদ* গ্রন্থে। তাঁদের বর্ণনায় জানা যায়, এই সংগীতরীতির ঐতিহ্য আজও ভারতের 'রাঢ়-ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে বেঁচে রয়েছে'। (কিরীতি ও মারিয়া ২০২১: ১০)

৭. সাম্প্রতিক কালের গবেষকদের কেউ কেউ চাঁচর ও চর্যাকে ভিন্ন দুটি সংগীতরীতি হিসেবে উল্লেখ করার পরিবর্তে একটি সংগীতরীতি বলেই সিদ্ধান্ত দিতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে কিরীটি মাহাত ও মিরিয়া মালিক প্রণীত *আদি চর্যাপদ* গ্রন্থের 'প্রাক্-কথন' থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা যায়। যথা: 'চাঁচর বা চর্যা দুটি পৃথক সংগীত নয়। বিষয়, ভাষা, ঐতিহ্য, চরিত্র, রূপক, প্রতীক, চিত্রকল্পের ব্যবহার, ছান্দসিক আদর্শ, সাংগীতিকতা ও রহস্যময়তায় উভয়ের মধ্যে মৌলিক ও অভিন্ন সাদৃশ্য বর্তমান' (কিরীতি ও মারিয়া ২০২১: ১২)। কিন্তু প্রাচীন বাংলার চর্যাপদের সুবিস্তৃত সাধন-সংস্কৃতির ঐতিহ্য বিচার করলে এতো সরলভাবে দুটি পরিবেশনরীতিকে অভিন্ন বলা সমীচীন নয় প্রতীয়মান হয়।

৮. *আদি চর্যাপদ* গ্রন্থের সংগ্রাহক ও সম্পাদক কিরীটি মাহাত এবং মারিয়া মালিক শ্লোকটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন: 'অর্থ অধ্যাত্ম বিষয়ে মিল আছে এবং দুই তিন জোড়া ছত্র। দ্বিতীয় অংশে এমনি, তাহাকে বলে চর্যা।' (কিরীতি ও মারিয়া ২০২১: ১২)

৯. শার্ঙ্গদেবকৃত *সংগীত-রত্নাকরের* সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদক সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদে এই অংশের অর্থ হলো: 'যাহা পদ্ধড়ী প্রভৃতি ছন্দে নিবদ্ধ, পাদান্তে অনুপ্রাস মণ্ডিত, আধ্যাত্মিক বিষয়ের বর্ণনাসম্বলিত এবং দ্বিতীয়াদি তালে গেয় তাহার নাম চর্যা। ইহা দ্বিবিধ—ছন্দের পূর্তিহেতু পূর্ণ এবং অপূর্তিহেতু অপূর্ণ। ইহার পুনরায় সমধ্রুবা ও বিসমধ্রুবা ভেদে দ্বিবিধ। ইহা সকল পাদের বা শুধু ধ্রুবাংশের আবৃত্তি সহকারে গীত হয়' (সুরেশচন্দ্র ১৩৭৯: ১৬৫-১৬৬)। শুধু তাই নয়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অনুবাদের টীকায় কল্লিনাথের ব্যাখ্যা যুক্ত করে 'পদ্ধড়ী ছন্দে'র প্রকৃতি সম্পর্কে লিখেছেন, 'যাহার প্রতিপাদে ষোলমাত্রা থাকে, যাহাতে জ-গণ থাকে না ও যাহার অন্ত্যবর্ণ গুরু হয় তাহার নাম পদ্ধড়ী ছন্দ।' অন্যদিকে 'দ্বিতীয়াদি তালে'র ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'আদি শব্দদ্বারা ইহার সমমাত্রাবিশিষ্ট অন্যতালকে বুঝান হইয়াছে।' (১৩৭৯: ১৬৫)

১০. নীলরতন সেন উদ্ধৃতিটির বঙ্গানুবাদে সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-অনূদিত *সংগীত-রত্নাকর* থেকে সাহায্য নিয়ে নিম্নরূপ ব্যাখ্যামূলক অর্থ করেছেন: 'আধ্যাত্মগোচর চর্যাগীতি পদ্ধড়ী (পজঝটিকা)

প্রভৃতি পাদান্ত অনুপ্রাসশোভিত ছন্দে রচিত; এবং দ্বিতীয়াদি তালযুক্ত (সঙ্গীতশাস্ত্রে দুটি দ্রুত ও একটি লঘু তালের নাম দ্বিতীয় তাল)। এর দুটি ভাগ: ছন্দ পূর্ণতা পেলে, পূর্ণা; আর তা না হলে, অপূর্ণা। আরো দুটি বিভাগ: সমদ্রুবা এবং বিসমধ্রুবা। সমধ্রুবাতে সব পাদেরই আবৃত্তি (repetition) হয়, বিসমধ্রুবাতে তা হয় না।' (২০০১: ৫৫)

১১. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ উল্লেখ করেছেন যে, 'পদ ও তাল—এই দুটি অঙ্গযুক্ত বলে চর্যাকে বলা হতো তারাবলী জাতীয় গান।' (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ১৯৭০: ৩১)

১২. এই পদের ছন্দের অসমতা সম্পর্কে সম্প্রতি থিবো দুবের ভিন্ন ধরনের একটি অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা হলো: চর্যাপদের আদি পাণ্ডুলিপিতে সম্ভবত 'এড়িএউ করণ-কপটের আস' পঙ্‌ক্তি লিপিবদ্ধ ছিল। আর এই পঙ্‌ক্তিতে লিপিবদ্ধ করার সময় লিপিকর 'করণ-কপটের' শুরুতে একটি সাঙ্কেলিত চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে শব্দ-বন্ধের ঠিক উপরের অংশে ব্যাখ্যামূলক 'ছান্দক বান্ধ' লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কারণ, 'ছান্দক বান্ধ' এবং 'করণ-কপট' সমার্থক। কিন্তু পরবর্তীকালের লিপিকর ব্যাখ্যামূলক 'ছান্দক বান্ধ' অংশটুকু মূল পঙ্‌ক্তির অংশ হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছেন। অবশ্য, তিব্বতি অনুবাদের আশ্রয়ে চর্যাপদ সংকলনে পার কেভার্নে এই অংশের পাঠ নির্ধারণ করেছেন এভাবে: 'eṛiu chāndaka bāndha kapāṭera āsa" (Kvrerne 1977: 67)। এক্ষেত্রে তিনি 'করণ' শব্দটি বাদ দিয়ে ছন্দের সমতা নির্মাণ করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর উক্তি হলো:

> I have deleted Ś *karaṇa*, as without it the line assumes a more normal length, but I have not done this without serious doubts, as M apparently has read *karaṇa* (unless M *karaṇa* has at some point found its way into CG, which seems less likely). T follows M (or the version of CG, containing karana, which M used): *byed-čiṅ*.
>
> *kapāṭa* must be 'door'. T, however, has either read a variant **kapaṭa=g.yo-sgyu*, or has (erroneously) interpreted *kapaṭa* as such. If we read M as *yāna-karaṇa-ādi, yāna* may perhaps be intended as an explanation of CG *kapāṭa* ('a door opening to a way of release'), but this would imply that 'door' has a negative value, as in the context of M, *yāna* is to be discarded. T *g.yo-sgyu* may also be directly due to MT (*sdeb-sbyor drug daṅ/) g.yo-sgyu byed-pa-la sogs-pa*, which must be based on the following reading of M: (*paścāc-chanda*) *moddiyāna-karaṇa-ādi*, MT *g.yo-sgyu* rendering **moddiyāna*, cf. mott(h)ika 'trickster, juggler' (BHSD p. 435).
>
> T *blo* 'mind' understands *āsa* as <*āsaya* 'mind, thought', cf. MT 10.4 *bsam-pas*=M *āsayena*; however, if *kapāṭa* 'door' is to be retained (and there is no reason to do otherwise), *āsa* (rhyming with *pāsa*) must mean 'near', cf. B *ās-pās* etc. (Turner 918). The exact significance of the image of the 'door' is not clear, but cf. M 21 *samādhi-kapāṭa* 'the door of S°'. T suggests the translation of CG: 'Having abandoned yogic postures (which imply) a deceptive hope (of release)'. (Kvrerne 1977: 68-69)

এই বর্ণনায় যে সব সংকেত ব্যবহার হয়েছে, তা হলো: Ś=হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, M=চর্যাপদের মুনিদত্তকৃত ব্যাখ্যা (সংস্কৃত পাঠ), CG=চর্যাগীতি (প্রাচীন বাংলা পাঠ), T=চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ, MT=মুনিদত্তের ব্যাখ্যার তিব্বতি অনুবাদ।

১৩. নীলরতন সেন ৪৩ সংখ্যক পদের ক্ষেত্রে সামান্য ভিন্ন পাঠ নিধারণ করেছেন, যথা: 'পদস্যোত্তর পদেন ধ্রুবপদং বোধব্যং'। তবে টীকাতে পাঠান্তর দিয়ে উল্লেখ করেছেন, শাস্ত্রী

'বোদ্ধবাং'। আলোচ্য চর্যাগীতে চারটিই শ্লোক। পৃথক ধ্রুবশ্লোক নেই। বাগচী অনুমান করেছেন এখানে একটি ধ্রুবশ্লোক ছিল। টীকাকার বা লিপিকর সেটি পাননি বলেই এই মন্তব্য। আমাদের অনুমান, এ গীতে চারটিই শ্লোক ছিল। পৃথক ধ্রুবশ্লোক ছিল না বলেই প্রত্যেক শ্লোকের অনুবর্তী শ্লোককে ধ্রুবশ্লোক বলে গণ্য করতে বলা হয়েছে। (নীলরতন ২০০১: ১১৩)

১৪. এই বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন এস এম লুৎফর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের *সাহিত্য পত্রিকার* ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের শীতসংখ্যায় প্রকাশিত 'বাউল শব্দের উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা' শীর্ষক প্রবন্ধের মাধ্যমে (১৩৭৬: ৯৩-১৩৭)। পরবর্তীকালে বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত *বাউলতত্ত্ব* গ্রন্থে আহমদ শরীফ এ বিষয়ে যৌক্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। (আহমদ ২০১৩: ৪৫-৪৬)

১৫. নেপালের চর্যাসংগীত-গুরু নরেন্দ্রমুণি বজ্রাচার্যের নিকট থেকে ১১ই সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত।

১৬. স্বরলিপিটি পরবর্তীকালে ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত করুণাময় গোস্বামীর *বাংলা গানের বিবর্তনে* (প্রথম খণ্ড) সংকলিত হয়েছে। (করুণাময় ১৯৯৩: ৩৪৭-৪৮)

সহায়কপঞ্জি

অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় (১৩৬৭)। *ঐতিহাসিক কহলন বিরচিত রাজতরঙ্গিণী* (অনূদিত)। কলকাতা: জি. ভরদ্বাজ অ্যাণ্ড কোং

অতীন্দ্র মজুমদার (১৯৭৩)। *চর্যাপদ*। ঢাকা: বুক ল্যান্ড

অলকা চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৮)। *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী*। কলকাতা: অনুষ্টুপ

আহমদ শরীফ (২০১৩)। *বাউলতত্ত্ব*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

উৎপলা গোস্বামী (১৩৬৭)। *বাংলা গানের বিবর্তন*। কলকাতা: সুরের মায়া

উৎপলা গোস্বামী (১৯৭১)। *ধ্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*। কলকাতা: ক্লাসিক প্রেস

করুণাময় গোস্বামী (১৯৯৩)। *বাংলা গানের বিবর্তন* প্রথম খণ্ড। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

করুণাময় গোস্বামী (২০২০)। 'ভাবনগর সাধুসঙ্গের চর্যাপদের গানের পুনর্জাগরণ', *বাংলা একাডেমি ফোকলোর পত্রিকা* ১ম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা হাবীবুল্লাহ সিরাজী (সম্পাদিত)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

কিরীতি মাহাত ও মারিয়া মালিক (২০২১)। 'প্রাক্-কথন', *আদি চর্যাপদ*। বাঁকুড়া: টেরাকোটা

চিত্রায়ুধ ঘটক (২০১৮)। 'বাংলার তথা বাঙালির উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চার ইতিহাস: একটি অনুসন্ধান', *সপ্তডিঙা*, উল্টোরথ সংখ্যা ১৪২৫ (Shoptodina Vol 4, No 1, 2018, ISSN 2395 6054)। লিংক: wordpress.com

জ্যোতি বিশ্বাস (২০০৮)। *সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত: ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিশ্লেষণ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

নরেন বিশ্বাস (১৯৯০)। *ঐতিহ্যের অঙ্গীকার-১* (অডিয়ো ক্যাসেট)। ঢাকা: শব্দরূপ।

নীলরতন সেন (১৯৭৪)। *চর্যাগীতির ছন্দপরিচয়*। কল্যাণী: কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

নীলরতন সেন (২০০১)। *চর্যাগীতিকোষ*। কলকাতা: সাহিত্যালোক

বিশ্বনাথ রায় (২০১৬)। 'চর্যার সাংগীতিক রূপ: "চাচা" বা "চচা" গান'। *অদ্বয়বঙ্গাল*: চর্যাপদ পুনর্জাগরণ উৎসব ২০২৪-এর স্মরণিকা নূরুননবী শান্ত (সম্পাদিত)। ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও ভাবনগর ফাউন্ডেশন

বিশ্বনাথ রায় (২০০৯)। 'চর্যাপদের সাহিত্যমূল্য: পুনর্নির্মাণের প্রেক্ষিতে', *বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

বৃন্দাবন দাস (৪৪৮ গৌরাব্দ)। *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগত*: অন্তখণ্ড-মূল, চতুর্থ অধ্যায় (ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী সম্পাদিত)। কলকাতা: শ্রীগৌড়ীয় মঠ

মঞ্জুলা চৌধুরী (২০২১)। *সন্ধ্যাকরনন্দী বিরচিতম রামচরিতম্: সংস্কৃতি সাহিত্যে ঐতিহাসিক কাব্য* (সম্পাদিত)। ঢাকা: ফেমাস বুকস্

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (২০০৬)। *বাংলা সাহিত্যের কথা* প্রথম খণ্ড: প্রাচীন যুগ। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

মোহা. মোশাররফ হোসেন (২০১২)। *বৌদ্ধ ঐতিহ্য*। ঢাকা: স্বরবৃত্ত প্রকাশন

রত্নকাজী বজ্রাচার্য (১৯৯৯)। *পুলাংগু ব নহূগু: চচা-মুনা, নহাপাংগু* ২য় খণ্ড। কাঠমান্ডু: স্বয়ম্ভু

রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ)। 'ভুমিকা', *রাজতরঙ্গিণী* (কহলন পণ্ডিত প্রণীত, অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় অনূদিত)। কলকাতা: জি. ভরদ্বাজ অ্যাণ্ড কোং

রাজ্যেশ্বর মিত্র (১৯৫৩)। *বাংলার সঙ্গীত* প্রাচীন যুগ। কলকাতা: টি. কে. ব্যানার্জি এন্ড কোং

রাজ্যেশ্বর মিত্র (১৩৬৬)। 'চর্যাগীতি', *বিশ্বভারতী পত্রিকা* ষোড়শ বর্ষ প্রথম সংখ্যা (পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত)। শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী

রাধাগোবিন্দ বসাক (১৯৫৩)। সন্ধ্যাকরনন্দী প্রণীত*রামচরিত* (অনূদিত)। কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স লি.

শঙ্খ ঘোষ (২০১৩)। *ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ*। কলকাতা: আজকাল পাবলিশার্স

শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯৮৯)। *নব চর্যাপদ* (সংগৃহীত ও সংকলিত)। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শার্ঙ্গদেব (১৮১১)। *সঙ্গীতরত্নাকর,* কালিনাথের টীকাসংযুক্ত (সম্পাদিত)। কলকাতা: আনন্দাশ্রম প্রেস

সাইমন জাকারিয়া (১৯৯৮)। 'ন নৈরামণি', *সহজিয়া* দ্বিতীয় সংখ্যা। ঢাকা

সাইমন জাকারিয়া (২০০৭)। *প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

সাইমন জাকারিয়া (২০১০)। *অবণাগবণ: সমকালীন বাংলাভাষায় প্রাচীন চর্যাপদের রূপান্তরিত গীতবাণী*। ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন

সাইমন জাকারিয়া (২০১৪)। *বোধিদ্রুম: একটি বুদ্ধ নাটক*। কলকাতা: নয়া উদ্যোগ

সাইম রানা (২০১৭)। 'চর্যা সুরের উৎস-সন্ধান', *সাহিত্য পত্রিকা* বর্ষ ৫৪ সংখ্যা ৩। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাদী মোহাম্মদ (১৯৯৩)। 'চর্যাপদ ২৮', *ঐতিহ্যের অঙ্গীকার-৫*। (নরেন বিশ্বাস নির্দেশিত অডিয়ো ক্যাসেট)। ঢাকা: শব্দরূপ।

সাধন সরকার (১৯৭৩)। *ফসল* প্রথম খণ্ড (মিজানুর রহিম সম্পাদিত)। খুলনা: স্কুল অব মিউজিক

সৈয়দ আলী আহসান (১৯৮৪)। *চর্যাগীতিকা: বৌদ্ধ গান ও দোহা* (সম্পাদিত)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ (২০১৭)। *নতুন চর্যাপদ*। ঢাকা: কথাপ্রকাশ

সুকুমার সেন (১৯৫৬)। *চর্যাগীতি-পদাবলী*। কলকাতা: ইস্টার্ণ পাবলিশার্স

সুকুমার সেন (১৯৬৬) *চর্যাগীতি-পদাবলী*। কলকাতা: ইস্টার্ণ পাবলিশার্স

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৭৯ বঙ্গাব্দ)। *শার্ঙ্গদেব প্রণীত সঙ্গীতরত্নাকর*, চতুর্থ অধ্যায়: প্রবন্ধাধ্যায়। কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সুশীলকুমার দে (১৩৫২ বঙ্গাব্দ)। 'বাংলা প্রবাদ: ছড়া ও চলতি কথা'। *বাংলা প্রবাদ: ছড়া ও চলতি কথা* (সম্পাদিত)। কলকাতা: এ. মুখার্জ্জী এণ্ড কো. লি.

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (১৯৬১)।*ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস* দ্বিতীয় খণ্ড: সঙ্গীত ও সংস্কৃতি। কলকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (১৯৭০)।*পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস* প্রথম খণ্ড। কলকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৯১৬)। *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

Per Kvrerne (1977). *An anthology of Buddhist Trantric Songs: A Study of Caryā-gīti.* Oslo: Universitetsforlaget

Prabodh Chandra Bagchi and Śānti Bhikṣu Śāstri (1956). *Caryāgīti-Koṣa or Buddhist Siddhas.* Santiniketan: Visva-Bharati

Nilratna Sen (1973). *Early Eastern New Indo Aryan Versification: A Prosodical Study of Carya Gita Kosa.* Simla: Indian Institute of Advanced Study

Nilratna Sen (1977). *Caryāgītikoṣa.* Simla: Indian Institute of Advanced Study

Tarapada Mukherji (1963). *The old Bengali language and text.* Calcutta: University of Calcutta